চাঁদে অভিযান

রুশ থেকে অনুবাদ

অনিমেষ পাল

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
১৯৫৭

১৯৫৪ সালের দশম সংখ্যা "জ্‌নানিয়ে-সিলা" (জ্ঞান ও শক্তি) পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়বস্তুকে বর্তমান সঙ্কলনটির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই রচনাগুলির লেখকবৃন্দ হলেন, যন্ত্রবিদ্যার স্নাতকোত্তর ছাত্র ক. গিল্‌জিন্‌ এবং ইউ. খ্লিয়েব্‌ৎ্‌সিয়েভিচ্‌; ইঞ্জিনিয়ার—ভ. লেভিন, ল. অরলফ্‌, ইউ. স্তেপানফ্‌, ই ফ্রিদ্‌মান; সাহিত্যিক—গ. গুরেভিচ্‌, ইউ. দল্‌গুশিন, কে. লিয়াপুনফ্‌ এবং এম্‌. পপোভ্‌স্কি।

সমস্ত বিষয়বস্তুর সম্পাদনা ও সংগ্রথিত করার কাজটি করেছেন ক. গিল্‌জিন এবং গ. গুরেভিচ্‌। পরিশিষ্ট—এন্‌. ভার্বারফ্‌।

'চাঁদে অভিযানের' ঘটনাকাল হচ্ছে ১৯৭৪ ; অর্থাৎ, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে এতে কল্পনায় বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। সেই হিসাবে এটি একটি কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু শুধুমাত্র কাহিনীর অংশটুকু ছাড়া আর কিছুই এতে কাল্পনিক নয়। গ্রহান্তর যাত্রার প রি ক ল্প না কে সফল করার উদ্দেশ্যে সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা যে-সব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ইতি-মধ্যেই করেছেন এবং আরো উদ্ভাবনের জন্য যে পথে তাঁদের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সেইসব কিছুর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগই এতে দেওয়া হয়েছে অভিযানটিকে উপলক্ষ্য করে। গল্প হিসাবে নয়, গ্রহান্তর যাত্রা সমস্যার সহজবোধ্য এক বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা হিসাবেই এই বইটির আসল সার্থকতা।

ভূমিকা

চাঁদে অভিযান

এই বইয়ে তোমরা পড়বে চাঁদে প্রথম অভিযানের কথা। এখনও অবশ্য কেউ চাঁদে যায়নি। তবে ভাবীকালের মানুষ সেখানে গিয়ে পৌঁছবে।

এই ভাবীকালটা কেমন হবে? তরুণ পাঠক, এ হল তোমাদের কাজ, অর্থাৎ তোমরা যখন বড় হবে তখন তোমরাই তো নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে কত কাজ করবে—বানাবে কত কী, গড়ে তুলবে, সৃষ্টি করবে, নির্মাণ করবে কত কী। তোমাদেরই সেই কাজকর্ম, তোমাদেরই সেই হাতের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই বই লেখা হয়েছে।

এই বইয়ের যারা নায়ক তারা তোমাদেরই সমবয়সী। এখন ওরা হয় স্কুলকলেজের ছাত্র, নয়তো কারিগর। যেমন ধরো, আলিয়োশা সোকোলফ এখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র; সে যে বিমানচালক হবে তা পর্যন্ত সে জানে না। অধ্যাপক সিজফও এখনো অবশ্য ছাত্রই, কিন্তু এরই মধ্যেই সে গ্রহান্তর যাত্রার স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন তো জীবনের মধ্যেই বাস্তব হয়ে ওঠে—আর এমনি করেই বিবর্তন হয়। একশো বছরও হয়নি, ডুবো জাহাজ আর উড়ো জাহাজ তখন ছিল স্বপ্ন, আর আজ তোমাদেরই বাবা কিংবা দাদা ওগুলোয় চড়ছেন। আণবিক বিদ্যুৎ

উৎপাদন কেন্দ্র চালনা, নতুন সমুদ্র সৃষ্টি, উত্তর অঞ্চলেও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বাগ-বাগিচার চাষ, বিশেষ অ্যাটমের ব্যবহার, হৃদপিণ্ডের অস্ত্রোপচার—আজকের দিনের এইসব ঘটনা বিগত শতাব্দীর চূড়ান্ত দুঃসাহসী কল্পনাকেও অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে।

আর গ্রহান্তর যাত্রা—বহুকালের এই স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন হয়েই রয়েছিল। অল্প কিছুদিন আগে ভিয়েনাতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশনে সোবিয়েত বিজ্ঞান আকাদামির সভাপতি আ, স, ন, ম, ইয়ামফ্ বলেছেন যে বিজ্ঞান আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যখন চাঁদে রকেট বিমান পাঠানো বাস্তব সম্ভাবনা হয়ে উঠেছে।

এরি মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিযুক্ত রকেট উঠে গিয়েছে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে, বেশ কয়েক শো কিলোমিটার উঁচুতে। প্রথম ধাপ এগোনো গিয়েছে। এখনও অবশ্য বহু বাধা অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন মানুষ চাঁদে গিয়ে অবতরণ করবে।

কিন্তু তা কবে ঘটে উঠবে? সাবধানী বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে এটা ঘটবে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই—তার আগে নয়। অন্যরা হিসেব করছেন, কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরই যথেষ্ট। সম্ভবত আমাদের তরুণ পাঠকরা এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠবে আর প্রাপ্তবয়স্করা হবে বৃদ্ধ। আমরা ধরে নিচ্ছি এই সময়টা যেন এরই মধ্যে কেটে গিয়েছে। তোমরা পাতা উল্টে যাও—আর তোমাদের সামনেই··············

পৃথিবী থেকে চাঁদ

১৯৭৪

পৃথিবী থেকে চাঁদ

১৯৭৪

প্রথম সংকলন

॥ গ্রহান্তরযাত্রী সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ভ, ন, খোমেঙ্কো
কর্তৃক সম্পাদিত ॥

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো ১৯৭৪

কমসোমলস্কায়া প্রাভদা

যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র

মঙ্গলবার—২৬শে নভেম্বর, ১৯৭৪ সাল

সোবিয়েত দেশের বিজ্ঞান আকাদামির ইস্তাহার

গ্রহান্তরগামী বিমান "চাঁদ—১"এর যাত্রা রম্ভ

২৫শে নভেম্বর, ঠিক ১০টার সময় প্রথম গ্রহান্তরগামী বিমান যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। ককেশাসের কাজবেক অঞ্চলে এই যাত্রারম্ভ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মানুষের এক শতাব্দীর স্বপ্ন সত্য হইল। মানুষের এই প্রথম দল ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়া গেল। এই মুহূর্তে গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে রহিয়াছেন চারজন সোবিয়েত বিজ্ঞান-কর্মী, বিমানের ক্যাপ্টেন মিখাইল আন্দ্রিয়েভিচ্ সিজফ্, বিমান চালক—সোবিয়েত ইউনিয়নের বীর—আলেকসিই ভিক্তরোভিচ্ সোকোলফ্, বিমানের এঞ্জিনিয়ার—নির্মাণকার্যের সহঃ অধ্যক্ষ—ইউরি নিকোলায়েভিচ্ তামাবিন, সহগামী চিকিৎসক—চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর গবেষক—তিগ্রাই আশোতোভিচ্ আকোপিয়ান।

অভিযানের লক্ষ্য হইল চাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সেখানে একটি বিজ্ঞান বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া। আমাদের এই উপগ্রহটি উন্নততর বিজ্ঞানের একটি শান্তিপুর্ণ পরীক্ষাগার হইয়া উঠিবে। কিছু কিছু বিদেশী সেনাপতি যেমন মনে করিয়া থাকেন তেমনতরো একটা লড়াইয়ের ঘাঁটি এটা নিশ্চয়ই হইবে না।

গ্রহান্তরগামী অভিযাত্রীরা নিয়মিত সংযোগরক্ষা করিবেন। অভিযানের গতিবিধির বিবরণ প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর রেডিও মারফত আসিতে থাকিবে।

—ঃ০ঃ—

প্রিয় পাঠকবর্গ,

২৫শে নভেম্বর, ১৯৭৪ সাল—যাত্রীসহ প্রথম গ্রহান্তরগামী বিমান চাঁদে অবতরণের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে।

বিজ্ঞান আকাদামির এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে—"মানুষের একশো বছরের স্বপ্ন সত্য হল। চারজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী ভূমণ্ডল ত্যাগ করে গিয়েছে।"

চাঁদে অভিযানের সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে আমাদের তরুণ পাঠকবর্গের আগ্রহ আছে তা জেনে সম্পাদকীয় দপ্তর দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, অভিযাত্রীদের চাঁদ থেকে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা না করেই এই প্রথম অভিযানের তথ্যাদি প্রকাশ শুরু করে দেওয়া হবে। সমস্তটা প্রকাশিত হবে দুইটি সংকলনে। প্রথম সংকলনে থাকছে গ্রহান্তরগামী বিমানের চালকদের এবং অভিযান প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ-কারীদের সঙ্গে কথোপকথন, যাত্রার কিছুদিন পরে লেখা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি এবং গ্রহান্তরগামী বিমান থেকে ও চাঁদ থেকে পাঠানো বেতার-বার্তা ইত্যাদি। চাঁদে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাদির আরো খুঁটিনাটি বিবরণ এবং অভিযানের ফলাফল প্রকাশ করা হবে দ্বিতীয় সংকলনে। এটি ভবিষ্যতে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালেই বার হবে।

প্রথম খণ্ড

যে সব সমস্যা অতিক্রম করতে হয়েছে

[একটি টেলিগ্রাম—

যোগাযোগ দপ্তর
সোবিয়েত ইউনিয়ন
ফটো-টেলিগ্রাম

কাজবেক নং—২২
......৫৪....নং....১

ঠিকানা...মস্কো...
সোবিয়েত মন্ত্রীদপ্তর
সোবিয়েত ইউনিয়ন

সরকারী সংবাদ—

গ্রহান্তরগামী বিমান "চাঁদ—১"এর যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ। বিমান পরীক্ষিত। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। অভিযানের অংশগ্রহণকারীগণ সুস্থ। যাত্রার জন্য ধার্য দিন—২৫শে নভেম্বর, ১০টা।

গ্রহান্তর সমিতির সভাপতি : ভ. ন. খোমেঙ্কা
,, প্রধান নির্মাণবিদ্ : এফ্ দেস্‌নিংসিন
বিমানের ক্যাপ্টেন : এম্. সিজফ্

অ্যাস্ট্রোনটিকস্ বা গ্রহান্তরগমন বিদ্যার জন্ম

কেন্দ্রীয় গ্রহান্তর গমনবিদ্যা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ

অধ্যাপক—**আ, ন, নেভিয়েরোফ্**

আজ যখন সমস্ত পৃথিবী ইতিহাসের প্রথম গ্রহান্তর যাত্রার চূড়ান্ত ফল সম্বন্ধে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে, তখন মনটাকে একবার সেই অতীতে টেনে নিয়ে যাওয়া যাক, যখন বিজ্ঞান প্রথম গ্রহান্তর যাত্রার সমস্যাগুলির কথা ভাবছিল।

···বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীর ঠিক সন্ধিক্ষণে। কালুগা,—জারের রাশিয়ার এক দূর মফঃস্বল শহর। নদীর ধারে ছোট্ট একটা বাড়ি। মাঝ রাত্রিরও অনেক পরে একটা জানালায় আলো জ্বলছে। কেরোসিনের বাতির আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় শূন্য একটা ঘরে—একটা মামুলি কাঠের টেবিল, বই, আর একগাদা ইস্কুলের খাতা ; গভীর চিন্তামগ্ন একটি মানুষ ঝুঁকে রয়েছে টেবিলের উপর। হাতটা শুধু কাগজের পাতার উপর একটা সাধারণ পেন্সিল দিয়ে একটা জটিল গণিতের সূত্র লিখতে লিখতে স্থির হয়ে গেছে।

এই লোকটার মাথায় এত কী চিন্তা এসে জমেছে ? একা একা এই বাড়িতে বসে সে কিসের স্বপ্ন দেখছে ?

সেই তিন চার শতাব্দী আগে সে-সময়ের একজন সাধারণ শিক্ষক কনস্তান্তিন্ এদুআর্দোভিচ্ ৎসিয়লকভ্স্কি এমন এক রকেটের নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিলেন যেটা

পৃথিবীর বার্তাবহ হয়ে যাবে চাঁদে এবং সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে। এই সময়কাল থেকে কয়েক দশক এগিয়ে এসে দেখা পাওয়া যাবে তখনকার দিনের এই অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিকের। এই বৈজ্ঞানিকের মাথায় এমন এক চিন্তা ঘুরছিল যা তাঁর সমসাময়িকদের অনেকেই আকাশকুসুম, অসংযত কল্পনা বলে মনে করতে লাগল। কিন্তু কেমন করে এই বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন বাস্তব সত্যে পরিণত হল আমরাই তো তার সাক্ষী। আমরা নিজেরাই তো বাস্তবে তার মূর্ত প্রতীক। আমরা গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে আমাদের মস্তক অবনত করি কন্‌স্তান্তিন্ এদুয়ার্দোভিচ্ ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির স্মৃতির উদ্দেশে। তাঁর বিস্ময়কর চিন্তা এবং বহুবর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্মোদ্যোগই গ্রহান্তর-গমন তথা মহাকাশ যাত্রা বিদ্যার সৃষ্টি সম্ভব করেছে। এই বিদ্যাকেই অ্যাষ্ট্রোনটিকস্ বা কস্‌মোনটিক্‌স নাম দেওয়া হয়েছে। (গ্রীক ভাষায় "আষ্ট্রোন্" মানে হলো গ্রহ-নক্ষত্র, "কসমস্" মানে হলো ব্রহ্মাণ্ড, মহাকাশ, আর "নাউটিকা" মানে হলো সাগর পাড়ি দেওয়া)। ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি এর নাম দিয়েছিলেন নক্ষত্র যাত্রা।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির বিশিষ্ট গবেষণা, "জেট চালিত যন্ত্র সাহায্যে মহাকাশের তথ্যানুসন্ধান," এটাই হলো গোড়াপত্তন গ্রহান্তর গমনবিদ্যার। এর মাত্র দশ কিম্বা পনের বছর পরেই বিদেশে গ্রহান্তর গমনবিদ্যার সম্পর্কিত কাজকর্ম শুরু হোল। গ্রহান্তরগমন বিদ্যার ভিত্তি এবং এর প্রাথমিক সমস্যাগুলি সমস্তই ৎসিওল্‌কভ্‌স্কিই

উপস্থিত করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় তা বিশ্লেষণও করেছেন। এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধানের সম্বন্ধে ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির যে বক্তব্য এবং এ বিষয়ে তাঁর যে চিন্তা, তাই রয়েছে সমস্ত সমসাময়িক গ্রহান্তরগমন বিদ্যার মূলে।

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপিত করে গেলেন, তা হচ্ছে—গ্রহান্তর গমনের জন্য তরল জালানি দ্বারা চালিত রকেট-এঞ্জিনের ব্যবহার করতে হবে। রকেট-এঞ্জিন থেকে যে উত্তপ্ত গ্যাস উদ্ভূত হয়, পেছন থেকে সেই গ্যাসের ধাক্কা এবং তার প্রতিক্রিয়া - একমাত্র এই শক্তিই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শেকল ছিঁড়ে গ্রহান্তরগামী বিমানকে শতসহস্র লক্ষ কিলোমিটার দূরে নিয়ে চলে যেতে পারে।

সাধারণ বারুদে তৈরি রকেটের কথা ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির বহু শতাব্দী আগে থেকেই জানা ছিল। বাজি বানানোর জন্যে, সঙ্কেত করবার জন্যে এবং অস্ত্র হিসাবেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এর প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু রকেটের মধ্যে গ্রহান্তর গমনের সম্ভাবনার একটা উপায় শুধু ৎসিওল্‌কভ্‌স্কিই দেখতে পেয়েছিলেন।

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সাধারণ বারুদে তৈরি রকেট গ্রহান্তরগমনের পক্ষে উপযুক্ত নয়। বারুদের এঞ্জিনের কাজ হয় সেকেণ্ডের একাংশ মাত্র সময়ের মধ্যে এবং এই সময়ের ভেতরে পুড়তে থাকে তার জালানি,— বারুদ। গ্রহান্তর গমনের জন্য দরকার আরেক ধরনের রকেট

এঞ্জিনের, যা আরো বেশি সময় ধরে কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু এরকম এঞ্জিন তখন ছিল না।

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি এমন একটা রকেট এঞ্জিনের উদ্ভাবন করলেন যার কাজ হবে কঠিন জালানি দিয়ে নয়, তরল জালানি দিয়ে। তরল জালানির দ্বারা চালিত জেট এঞ্জিন না হলে আজকালকার সমস্ত জেট পদ্ধতির উড্ডয়নপ্রচেষ্টা অসম্ভব হয়ে পড়ত (এবং অসম্ভব হয়ে পড়ত শব্দের চেয়েও দ্রুত গতি-বেগের পাল্লায় যাওয়া)। নীল আকাশে সাদারেখা আঁকতে আঁকতে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলে যায় যে জেট্‌ বিমানগুলো তা দেখেনি কে? প্রথম জেটবিমানটির আবির্ভাবেরও বহু বছর আগে এই জেটবিমানের যুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি।

কিন্তু জেট্‌ এঞ্জিনের বিমানও গ্রহান্তরগমন সফল করে তুলবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কারণ এদের উড়বার জন্য দরকার বায়ুমণ্ডলের ; কিন্তু মহাশূন্যের মধ্যে তো আর বায়ুমণ্ডল নেই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মহাশূন্যের যাত্রীবিমানের জন্য দরকার এমন এঞ্জিনের যেটা চলবে তরল জালানির দ্বারা এবং তাছাড়া যার জন্য দরকার হবেনা বায়ুমণ্ডলের।

এরকম এঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি। এর নাম হলো 'তরল রকেট এঞ্জিন'।

এই এঞ্জিনই ৭৫ বছর ধরে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রথম চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর ৎসিওলকভস্কির ধারণাগুলি

ধীরে ধীরে বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল। তারপরে আবার এই শতাব্দীর মাঝামাঝি তরল রকেট এঞ্জিনের খুব দ্রুত উন্নতি হয়ে গেল। ক্রমেই বেশি বেশি করে এইগুলি ব্যবহার করা হতে লাগল সুদূর উচ্চতার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের রকেটগুলিতে, জঙ্গীবিমানগুলিতে এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসমূহে। উড়োজাহাজ আর রকেটগুলি এই এঞ্জিনসহ আরো বেশি বেশি উঁচুতে, দূরে এবং দ্রুতগতিতে উড়তে শুরু করল। মানুষের আয়ত্তে এল উচ্চতা, আয়ত্তে এল সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েক কিলোমিটার ছুটে যাওয়ার গতিবেগ, আয়ত্তে এলে বহু সহস্র কিলোমিটারের দূরত্ব। তরল রকেট এঞ্জিন নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠল।

যাই হোক এই এঞ্জিনের সৃষ্টিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রহান্তর যাত্রার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারল না (যদিও প্রধান সমস্যাটির সমাধান এরই উপরে ভিত্তি করে হয়েছে)। যে বিমানকে চাঁদে কিম্বা সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলিতে যেতে হবে সে বিমান কেমন হওয়া দরকার ? ৎসিওলকভস্কি এই প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিয়ে গেছেন।

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি জানতেন যে গ্রহান্তর যাত্রার পথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই বাধাকে অতিক্রম করার জন্য বিমানের এমন একটা প্রচণ্ড গতিবেগ দরকার যা মাধ্যাকর্ষণজনিত গতিবেগের থেকে কম হবে না। অর্থাৎ যা সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটারের সমান হবে। এই রকম একটা অভূতপূর্ব

গতিবেগ যদি বিমানকে অর্জন করতে হয় তাহলে কি পরিমাণ জালানি খরচ করা প্রয়োজন? এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন রকমের গ্রহান্তরগামী বিমানই পাঠানো সম্ভব নয়। শূন্যযাত্রার সমস্ত সময়টিতেই গ্রহান্তরগামী বিমানের দেহটি যদি একই রকম থাকত তবে এই সমস্যাটির সমাধানে কোন ঝামেলা হত না। কিন্তু সমস্ত রকেটেরই যেমন হয়ে থাকে তেমনি গ্রহান্তরগামী বিমানের দেহটাও উড়তে উড়তে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বিমানটা ক্রমেই খুব তাড়াতাড়ি ছোট হয়ে যায়।

উড়বার জন্য গ্রহান্তরগামী বিমানে যে মজুত জালানি থাকে তা বিমানের দেহের একটা বেশ বড় অংশ জুড়েই থাকে। বিমানের নিজের দেহটি এবং তার প্রয়োজনীয় মালপত্র জালানির তুলনায় খুব সামান্যই হয়। প্রায় সব জালানিই খরচা হয়ে যায় বিমানের গতিবেগ অর্জনের কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অতএব বিমানের দেহটিকে অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির আগে গতিবিজ্ঞান-যন্ত্রবিদ্যা যে রকম ছিল তাতে, আয়তন পরিবর্তন হচ্ছে যে বস্তুপিণ্ডের তার গতিবেগ পরিমাপ করতে পারা যেত না। আকাশে—আয়তন-পরিবর্তনশীল বস্তুপিণ্ডের গতি সম্পর্কে গতিবিজ্ঞানকে নতুন করে পথ খুঁজতে হল—তা না হলে পৃথিবীর উপরিভাগে রকেটের উড্ডয়নের পরিমাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। যন্ত্রবিদ্যার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উদ্ভাবনের সম্মানও

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির। মজার ব্যাপার এই যে ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির সঙ্গে ঠিক একই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে আরেকজন খ্যাতনামা রুশবিজ্ঞানী—ই, ভ, মেশ্চেস্কি এই একই সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। আপন আয়তন পরিবর্তনশীল বস্তুপিণ্ড সম্পর্কিত যন্ত্রবিদ্যার চর্চা এবং রকেটের গতিবেগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান—রকেট ডাইনামিকস্‌ এবং অ্যাষ্ট্রোনটিকস্‌—এরও তাত্ত্বিক ভিত্তিস্থাপনা ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির মহৎ অবদানগুলির অন্যতম।

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির সূত্রের নাম অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবীই তাঁকে জানে রকেটের গতিবিধি সম্পর্কিত নিয়মকানুনগুলির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে।

সূত্রটা হল এই রকম—

$$V = 2,3\,W.\,\lg\left[\frac{Mk + Mm}{Mk}\right]$$

V—হলো রকেটের চূড়ান্ত গতিবেগ; W—হলো এঞ্জিনের মুখ থেকে বার হয়ে আসা গ্যাসের গতিবেগ; Mm—হলো জালানির পরিমাণ; Mk—হলো বিমানদেহের পরিমাণ, যন্ত্রপাতি ও রকেটের প্রয়োজনীয় ভারবস্তু।

প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জনের জন্য বিমানে কতটা জালানি বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার তাঁর পরিমাপ করবার সুযোগ এই সূত্রটি করে দিয়েছে।

রকেট যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি যে আরো কত বেশি দরকার তার অতি সামান্য ইঙ্গিতই এই সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে। রকেটের

গতিবেগ—V বাড়াবার জন্য হয় বাড়াতে হবে W, অর্থাৎ বার হয়ে আসা গ্যাসের গতিবেগ, নয় বাড়াতে হবে $\left[\frac{Mk+Mm}{Mk}\right]$—অর্থাৎ জালানি সমেত রকেট দেহের সাথে জালানি বাদ দিয়ে রকেট দেহের অনুপাত। অর্থাৎ রকেটের ওজনের মধ্যে জালানির অংশ বাড়াতে হবে।

রকেট এঞ্জিনের নির্মাতারা প্রথম পথ ধরে এগিয়ে চললেন, অর্থাৎ এঞ্জিনের জন্য নতুন জালানির সন্ধান করতে এবং সেই জালানিকে ঠাণ্ডা রাখার পদ্ধতির উন্নতিবিধান করতে লাগলেন। এইভাবেই বার হয়ে আসা গ্যাসের গতিবেগ বাড়াবার জন্যে তাঁরা ক্রমাগত চেষ্টা চালাতে লাগলেন। বছর কুড়ি আগে যে উন্নততর তরল রকেট এঞ্জিন তৈরি হয় তাতে এই গ্যাসের গতিবেগ হয়ে উঠেছিল সেকেণ্ডে ২৫০০ মিটারের কিছু বেশি। আজকাল এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সেকেণ্ডে ৪০০০, এমন কি ৪৫০০ মিটারের মত।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে রকেট যন্ত্রবিদ্যার উন্নতিবিধান। রকেটের মধ্যে আনুপাতিক ভাবে জালানির মজুত বৃদ্ধি করা। উড়বার সময় রকেটের মোট ওজনের মধ্যে জালানির ওজনের অংশ যত বেশি হবে ততই রকেটের গতিবেগ বেড়ে যাবে। যে রকম রকেট বানানো সম্ভব হয়েছে তাতে জালানির ওজন রকেটের নিজের ওজনের তিন থেকে চারগুণ পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু মহাশূন্যে ভ্রমণের জন্য দরকার এত বেশি জালানি যার ওজন রকেটের নিজের ওজনের থেকে শত শত গুণ বেশি হবে।

এই সমস্যাকে দুরতিক্রম্যই মনে হয়েছিল। এই সমস্যাই অতিক্রম করার আশ্চর্য সম্ভাবনা আবার দেখিয়ে দিলেন ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি। তিনি সংযুক্ত রকেট বা রকেট ট্রেন ব্যবহারের প্রস্তাব করলেন। গ্রহান্তরগামী "রকেট ট্রেন" তৈরি হবে কয়েকটি পরস্পর সংযুক্ত রকেট দিয়ে ; তারপর, যে রকেটটিতে সমস্ত জালানিটা জমা ছিল সেটা ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়বে। ফলে হয়ত একটা প্রচণ্ড গতিবেগ পাওয়া যাবে। ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির এই ধারণাগুলোর অনেক প্রয়োগ হয়েছে রকেট যন্ত্রবিদ্যায়। এই ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন সোবিয়েত বিজ্ঞানী এফ, আ, ৎসান্‌দের। তিনি প্রস্তাব করলেন যে ফুরিয়ে যাওয়া এই প্রাথমিক রকেট-গুলি পৃথিবীতে ফেলে না দিয়ে বিশেষ চুল্লীতে গলিয়ে ফেলা হোক এবং এগুলো বিমানের রকেট এঞ্জিনগুলোতে পোড়ানো হোক। এমন একটা অকেজো জিনিসকে বদলে যদি মূল্যবান জালানিতে পরিণত করা যায় তাহলে যে বিমানের গতিবেগ সুকৌশলে বিশেষভাবে বর্ধিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৎসান্‌দের সর্বপ্রথম তরল রকেট এঞ্জিনের মধ্যে ধাতব জালানির প্রজ্জ্বলনের পরীক্ষা করলেন।

'রকেট ট্রেন' বা সংযুক্ত রকেট কাজে লাগানো হচ্ছে বহুদিন ধরেই। এই সংযুক্ত রকেটের আবিষ্কারের ফলে মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির প্রশ্নটির মূল্য কমে গেল (এদের সম্বন্ধে বেশি উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না)।

কিন্তু এই গ্রহান্তরগামী রকেট ট্রেনও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের

শিকল ছিঁড়ে যেতে পারে না, আর মানুষকে নিয়ে গ্রহান্তরে কিংবা চাঁদেও গিয়ে পৌঁছুতে পারে না।

ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির প্রতিভা আবার একটি নতুন চিন্তার জন্ম দিল, যা বহুদিন পর্যন্ত আকাশ-কুসুম কল্পনা বলে পরিগণিত হয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সময়কালেই এ চিন্তা স্বীকৃত হয়েছে এবং প্রতিবৎসরই আরো বেশি বেশি করে এর গুরুত্ব বাড়ছে। প্রশ্নটা হল—পৃথিবীর এমন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা যায় কিনা যাকে পৃথিবী-সমীপবর্তী মহাশূন্যে জ্বালানি নেওয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাদির জন্য একটি মধ্যবর্তী স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করতে পারা যায়। আগেকার কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এখনো স্বয়ংচালিত এবং মানুষ-শূন্য অবস্থায় রয়েছে; পৃথিবীর চতুর্দিকে তাদের অনন্ত পরিক্রমা আরম্ভ করেছে মাত্র। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলো বিজ্ঞানের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। কিন্তু এইসব ক্ষুদ্র উপগ্রহগুলি যে গ্রহান্তর চলাচল পথের মধ্যবর্তী স্টেশন হয়ে উঠবে—সে সম্ভাবনা এখনও অনেক দূরে। মহাশূন্যে জ্বালানি জোগান দেওয়ার ব্যাপারটা তাই এখনও প্রচণ্ডভাবে সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। কিন্তু এমন দিন আসছে যখন বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন শত শত কৃত্রিম উপগ্রহ গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে পৃথিবী এবং চাঁদের চতুর্দিকে বিভিন্ন স্তরের উচ্চতায় ছড়িয়ে পড়বে; তারপর ঘোরাফেরা করতে থাকবে শুক্র, মঙ্গল এবং সূর্যের চতুর্দিকে। এদের সহায়তায় সম্ভব হয়ে উঠবে সৌর-

মণ্ডলের সুদূরতম কোণগুলি পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে আসা। সোবিয়েত বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ার, ছাত্র এবং ৎসিওলকভস্কির অনুগামীদের কর্মকুশলতাকে ধন্যবাদ। রকেট যন্ত্রবিদ্যার দ্রুত উন্নতি হয়ে চলেছে। আমাদের দেশের যাত্রীবাহী বিমানপথ-গুলোতে এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়েও বহুদূরে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিমান নিখুঁত ছোট এঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয়ে যাতায়াত করছে। আমাদের নিজেদের শক্তিশালী বিমানবহর আছে। আমরা এখন গড়ে তুলছি গ্রহান্তরগামী বিমানবহর। কনস্তান্তিন এদুয়ার্দোভিচ্ ৎসিওলকভস্কি যে গ্রহান্তর গমন-বিদ্যার উদ্ভাবন করেছেন, তাঁর সেই কীর্তির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ এটাই।

গ্রহান্তর স্টেশন

ক, দ, সাভেলিয়েভ

বিমানক্ষেত্রের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার

নভেম্বর মাস। পাহাড়ে শীত নেমেছে। তুষারের সীমারেখা নেমে এসেছে উপত্যকার উপর; সাদা হয়ে উঠেছে পাথুরে মাঠ; গিরিপথ ঢেকে গিয়েছে পুরু বরফে। দূর খাদের মধ্যে গ্রামগুলি এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রইল সেই মে মাস পর্যন্ত। ওখানেও শীত পড়তে শুরু করেছে। খবরের কাগজ, চিঠিপত্র ইত্যাদি ওখানে এখন পৌঁছে দেওয়া হয় হেলিকপ্টার দিয়ে।

খাদগুলোর একটার মধ্যে কিন্তু চলাচল বন্ধ হয়নি। লরীর স্রোত আসা-যাওয়া করছে, যেন তার শেষ নেই, বরফ
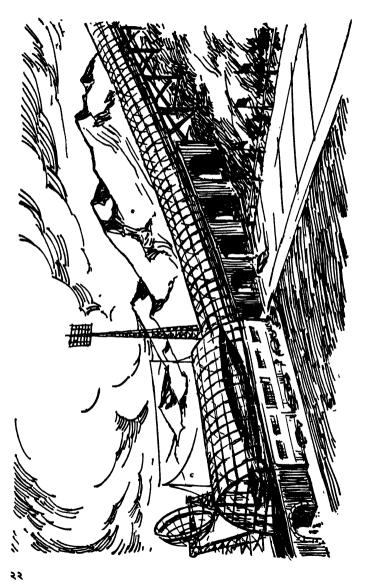
সরাতে সরাতে গর্জন করছে বুলডোজারগুলো। এমন কি ভেঙে পড়া বরফের বড় বড় চাঙড়গুলো পর্যন্ত গাড়িগুলোকে আধঘণ্টার বেশি ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। কাজবেক পাহাড়ের পাদদেশে নতুন ছোট্ট শহরের রাস্তাটা এখান দিয়েই গেছে। শহরটা নেহাতই ছোট্ট—একটা কারখানা, একটা গুদামঘর, বিমানশালা আর কয়েকটা বসতবাড়ি। এর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় জিনিস হল একটা ঢালু সেতু। বড় বড় বরফের চাঙড় আর নালার উপর দিয়ে, লালচে রংয়ের রুক্ষ শতছিদ্র পাথর কেটে সেতুটা উঠে গিয়েছে উপরের দিকে, উঁচু থেকে উঁচুতে, যেখানে কাজবেক পাহাড়ের রূপোলি চূড়োটা গিয়ে ঠেকেছে মেঘের গায়ে।

পাহাড়ের পাদদেশে এই যে ছোট্ট শহরটি, এটিই হলো পৃথিবীর প্রথম গ্রহান্তর-যাত্র স্টেশন, আর ঐ ঢালু সেতুটা হল গ্রহান্তরগামী বিমানের 'উড্ডয়ন সেতু'। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শিকল ছিঁড়ে এখান থেকেই বিমান পাড়ি জমাবে চাঁদের দিকে।

পৃথিবীর শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণকে জয় করবার জন্য সবার আগে দরকার প্রচণ্ড গতিবেগের। সামান্যতম জালানি খরচ করে প্রচণ্ড গতিবেগ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি আমরা সবাই, আমরা গ্রহান্তর স্টেশনের নির্মাতারা, ড্রাফট্‌স্‌ম্যানরা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, বিমানের পরিকল্পনাকারীরা এবং নির্মাণবিদেরা।

আরো বেশি গতিবেগ সম্ভব করার জন্য যাতে পৃথিবীর আহ্নিকগতিকে কাজে লাগানো যায় সেইজন্য গবেষণা করা হচ্ছে। স্রোতের প্রতিকূলের চেয়ে স্রোতের অনুকূলে নৌকো

অনেক বেশি জোরে বেয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। গ্রহান্তরগামী বিমানের গতিবেগও বৃদ্ধি পাবে যদি তা পৃথিবীর আবর্তনের দিকে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবে উড়তে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর আবর্তনের গতি সব জায়গায় একই রকম নয়। এই গতিবেগ মেরুদেশে প্রায় শূন্য, কিন্তু নিরক্ষরেখায় গিয়ে সেকেণ্ডে ৪৬৫ মিটার হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যে গ্রহান্তর স্টেশনের অবস্থান মেরু থেকে যতটা সম্ভব দূরে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, তাই আমরা বেছে নিয়েছি মধ্য ককেশাস্ ৪৩° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ। এখানে পৃথিবীর আবর্তনের গতি সেকেণ্ডে ৩৪০ মিটারের (৩৯·৩৭ ইঞ্চি=১ মিটার) কাছাকাছি। সেকেণ্ডে ৩৪০ মিটার —এটা নিশ্চয়ই আমাদের কাজের পক্ষে বড়ো কম নয়।

আকাশের ঘন বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে পাড়ি দিতে গেলে গ্রহান্তরগামী বিমানকে কিন্তু আগে বাতাসের এই বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। এই জন্য সব থেকে ভালো হল কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ো থেকে রওনা দেওয়া,—যেমন সমুদ্র-সমতল থেকে পাঁচ কিলো-মিটার (১ কিলোমিটার=৩২৮০·৮৯ ফুট) উঁচু কাজবেক। এখানকার বায়ুর চাপ সমুদ্রসৈকতের চাপের প্রায় অর্ধেক। উড্ডয়ন-সেতু থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর বেশ একটা বড় অংশই বিমানটির পিছনে পড়ে থাকবে।

বিমান এবং তার প্রধান ভারবস্তু জালানির ওজন যথাসম্ভব কম করতে হবে। তাই প্রাণপণ শক্তিতে বিমানটিকে উড্ডয়ন-

সেতুর উপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া এবং যতদূর সম্ভব বেশি গতিতে তাকে উড়িয়ে দেওয়া খুবই জরুরি। এটা করতে পারলে পথে বিমানের খুব কম জালানির দরকার হবে। বিমানটাকে ওড়াবার কাজে উড্ডয়ন-সেতু ব্যবহার করা যাবে কাজবেকের চূড়ো পর্যন্ত। যাত্রারম্ভ করা হবে পাহাড়ের একেবারে তলা থেকে। ২৫শে নভেম্বর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ১০টার সময়ে আমি একটা বোতাম টিপে দিলেই মঞ্চের উপর স্থির হয়ে আছে যে গ্রহান্তরগামী বিমানটা তার এঞ্জিনগুলো চলতে শুরু করে দেবে। বেশিক্ষণ নয়,—এই এঞ্জিনগুলো সবশুদ্ধ কাজ করবে মাত্র ২৫ সেকেণ্ড। ২৫ সেকেণ্ড ধরে এঞ্জিনগুলো প্ল্যাটফর্ম আর ভারী বিমানটাকে জোরে এগিয়ে নিয়ে যাবে পাহাড়ের চূড়োর দিকে। সেখান থেকে দুটো দু পথে যাবে: প্ল্যাটফর্মটা গড়িয়ে আসবে নীচের দিকে, আর ছাড়া-পাওয়া বিমানটা উড়ে যাবে ওপরে। পাহাড়ের চূড়োর ওপর এর গতিবেগ দাঁড়াবে সেকেণ্ডে ৬৫০ মিটার আর ঠিক এই সময়েই বিমানের নিজের এঞ্জিনগুলো শুরু করবে কাজ করতে।

এতদিন পর্যন্ত গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে শুধুমাত্র যাত্রীবিহীন স্বয়ংক্রিয় রকেটই পাঠানো হয়েছিল।

উড়বার জন্য তৈরি উঁচু ধাতব মিনার থেকে এদের যাত্রারম্ভ করিয়ে দেওয়া হত।

"চাঁদ—১" এর জন্য অবশ্য আরো বড় নিখুঁত উড্ডয়নসেতু তৈরি করা হয়েছে—ককেশাস গ্রহান্তর-যাত্রা স্টেশন। প্রথম

বিমানটির পরে এখান থেকে রওনা দেবে "চাঁদ—২"। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের এই স্টেশন থেকেই 'মঙ্গল—১' এবং 'শুক্র—১' প্রভৃতি বিমানগুলি তাদের যাত্রা শুরু করবে।

ভূমণ্ডলের বার্তাবহ

(সাংবাদিক সম্মেলনের রিপোর্ট)

ডাক্তার অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ নিলেন—আমরা কতজন সংবাদপত্র প্রতিনিধি এসেছি, সবাই এসে পৌঁছেছে কিনা, আমাদের প্রশ্নের তালিকা তৈরি আছে কিনা, আমরা একই প্রশ্নের পুনরুক্তি করে ফেলব কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর তিনি বললে, "—পৃথিবীর উপরে দূর পাল্লার উড্ডয়নের আগেও সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মনে রাখবেন এক ঘণ্টার মধ্যেই সম্মেলন শেষ হয়ে যাবে। কোন অতিরিক্ত প্রশ্ন নয় এবং কোনরকম অতিরিক্ত সাক্ষাৎকারও নয়। গ্রহান্তরগামী যাত্রীদের বিশ্রাম করানোটা আমার দায়িত্ব। এমন কি পরিবারের লোকদেরও এখানে আসতে অনুমতি দেওয়া হয়নি।"

ঝল্‌মলে উজ্জ্বল বারান্দায় আমরা অপেক্ষা করছি। সব চুপ-চাপ। এই মুহূর্তে এই বাড়িতে বিশ্রাম করছে চারটি মানুষ—তাঁরা "চাঁদ—১" বিমানটির কর্মী। শরৎকালের শেষ দিক। মফস্বল শহর—প্রায় জনমানব শূন্য, বড় রাস্তার উপর লোক দেখা যাচ্ছে না একটিও। শুধু আমাদের নিচে দিয়ে পাহাড়ি নদীগুলো একটানা গর্জন করে চলেছে। এগুলোর মধ্যে

একটার জল ফেনাময় সাদায়-নীলে মেশা, আরেকটা একেবারে কালো। ঠিক এই বিশ্রামাগারের কাছে নদীত্বটো এসে একত্র হয়েছে, কিন্তু এদের জল মিশে যায়নি মোটেই, ডানদিকের পাড় দিয়ে বয়ে চলেছে একটা উজ্জ্বল ধারা আর বাঁদিক দিয়ে একটা কালো ধারা। এমনি করে ওরা পাশাপাশি চলে গিয়েছে একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত, কিন্তু একটা নদীও অন্যটার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দরজা খুলে গেল। ঐ ত আমাদের সামনেই ওরা—চন্দ্রে গমনোদ্যত পৃথিবীর দূতবৃন্দ! সামনেই বিমানের ক্যাপ্টেন মিখাইল আন্দ্রিয়েভিচ্ সিজফ্। ছোটখাট গড়নের স্কী করার ঢিলে পোশাকে তাঁকে বেশ শক্ত সমর্থ দেখাচ্ছে।

বিমান চালক সোকোলফও স্কী করার পোশাকে। তাঁরা সবাই পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছেন। নির্মাণবিদ্ এবং ডাক্তার খেলছিলেন দাবা। এঁদের একজনের বগলের নিচে রয়েছে দাবার বোর্ডটা। দেখে বোঝা যাচ্ছে জিতেছেন ডাক্তারই –তাঁর কালো চোখত্বটো উৎসাহে চক্চক্ করছে আর ঠোঁটের উপর রয়েছে এক টুকরো হাসি। ইঞ্জিনিয়ার তাকিয়ে আছেন গম্ভীর আর চিন্তামগ্নভাবে, সম্ভবত তিনি তখনও তাঁর শেষ নিষ্ফল 'চাল'টির কথা ভেবে দেখছিলেন।

যেমন ঠিক করা ছিল—-আমাদের মধ্যে থেকে একজন—যিনি বয়সে সকলের বড়—সাধারণ প্রশ্নগুলি উত্থাপন করলেন।

উনি বললে—আমরা চাই যে আপনারা আপনাদের

নিজেদের সম্বন্ধে কিছু বলুন—এই আপনাদের জীবন, আপনাদের কাজ, এইসব সম্বন্ধে।

উত্তর দিলেন অধ্যাপক সিজফ্। উনি আরম্ভ করলেন—“বিশদ বলার সময় এখন আমাদের নেই। যখন আমরা চাঁদ থেকে ফিরে আসব তখনই ওসব বলা যাবে। এই ত আমরা,—চারজন সাধারণ সোবিয়েত বিশেষজ্ঞ। চাঁদে উড়ে যাওয়ার ভার পড়েছে আমাদের উপর। আমি—জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেছি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানেই গবেষণা করেছি অ্যাষ্ট্রোফিজিক্স্ বা জ্যোতিঃ-পদার্থবিদ্যা এবং আকাশব্যবস্থা নিয়ে, চাঁদ এবং গ্রহগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা করেছি, আর এখনো সেই মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করে থাকি। আমার বয়স এখন ৪১ বৎসর। আমাদের সাথী ইঞ্জিনিয়ার তামারিন বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবেন। ইনি আমাদের বিমান-নির্মাণ কার্যের সহকারী অধ্যক্ষ। বলতে কি—এই অভিযানে আমি হলাম বিজ্ঞানের ‘তত্ত্বে’র মতো। আর আমার এই সাথী তামারিন হলেন বিজ্ঞানের ‘প্রয়োগ-কৌশল’ স্বরূপ। ইনি শিশুসদনে বড় হয়েছেন, এঁর মা বাবা ফ্যাশিষ্টদের হাতে মারা গিয়েছিলেন। শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে, তামারিন বিমান কারখানায় টার্ণারের কাজ করেন এবং পত্রযোগে আরও লেখাপড়া করতে থাকেন এবং নির্মাণবিদ ইঞ্জিনিয়ার হন; আধুনিকতম উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন বিমান সমূহের নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন, স্বয়ংক্রিয় রকেট সমূহের পরিকল্পনা করেন এবং

শেষে যেখানে আমাদের বিমানের জন্ম হয়েছে সেই "এল" প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ডাক্তার আকোনিয়ান বৈমানিক ভেষজবিদ্যা ইনষ্টিট্যুটের সঙ্গে সংযুক্ত। আয়নোস্ফিয়ার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধতন স্তর দিয়ে যাতায়াতকারী বিমান পথ সমূহের তিনি ছিলেন প্রধান ডাক্তার। "বহির্জাগতিক জীববিদ্যা" নামে তিনি একখানি বৈজ্ঞানিক বই লিখেছেন। বিমানচালক সাথী সোকোলফ আমাদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ। উনি জন্মেছেন ১৯৪৫ সালে, ১ মাস আগে তার ২৯ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এরি মধ্যে উনি 'সোবিয়েত ইউনিয়নের বীরে'র খেতাব পেয়েছেন ; উচ্চতা এবং দূরত্বে রেকর্ড সৃষ্টিকারী উড্ডয়নগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন। মস্কো—উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু—মস্কো, পৃথিবী ঘুরে এই পথে বিরামহীন বিমান চালনায় তিনিই ছিলেন বৈমানিক। পত্রিকাগুলিতে এ সম্বন্ধে প্রচুর লেখা হয়েছিল। এই হল আমাদের সম্বন্ধে মোটামুটি যা বলবার। আমার মনে হয় এই যথেষ্ট।

কিন্তু আপনাদের কাগজের পাঠকদের মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রথম গ্রহান্তর যাত্রার প্রস্তুতি করেছেন বহুলোক মিলে—জ্যোতির্বিজ্ঞানী, নির্মাণবিদ এবং আরো বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা। চাঁদে অভিযান তাঁদের সকলেরই সমান কৃতিত্ব। এ কাজে নেতৃত্ব করেছেন গ্রহান্তর সমিতির সভাপতি ভ, ন, খোমেঙ্কো এবং নির্মাণাধ্যক্ষ দেস্‌নিৎসিন্। আমরা এতে সাহায্যকারী হিসেবেই অংশগ্রহণ করেছি। বহুসংখ্যক আবেদনকারীর মধ্যে থেকে আমাদের বেছে নিয়ে আমাদের প্রতি আস্থা এবং

সম্মানই জ্ঞাপন করা হয়েছে। নিজের সম্বন্ধেই বলছি: আমার মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক আমাদের দেশে শত শত আছেন। আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ আমি চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তা ছাড়া আমার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর, আমি স্কী করবার পোশাক পরি, ভলিবল খেলি আর আমার হার্ট খুবই সুস্থ। আমরা চারজন—এক বৃহৎ সমবায়ের প্রতিনিধি; জনসাধারণের একটি কাজ সম্পূর্ণ করবার ভার পড়েছে আমাদের উপর। তাই আমাদের নয়, জনসাধারণেরই এই কাজ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন।"

ইতিমধ্যে ডাক্তার তাকাচ্ছেন ঘড়ির দিকে—সময় শেষ হয়ে গেছে। ভদ্রভাবে হলেও কিন্তু বেশ কড়াভাবেই তিনি আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন ভেঙে দিলেন।

বিদায়ের সময় অধ্যাপক সিজফ্ আমাদের কাছে কয়েক পাতা কাগজ এগিয়ে দিলেন।

"—যদি আপনারা চান, এখানে আরো বিস্তারিত ভাবে এই কাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করা আছে।"

এই রচনাটিকে আমরা অধ্যাপকের ভাষাতেই নাম দিয়েছি—"চল যাই চাঁদে।"

চল যাই চাঁদে

"চাঁদ—১" এর ক্যাপ্টেন

অধ্যাপক **ম, আ, সিজফ**

বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের যৌথ প্রচেষ্টাই গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে আমাদের পথ করে দিয়েছে।

বিগত দুই দশকে যে প্রচুর কাজ হয়েছে তা থেকেই আমাদের সাফল্যের আশা করা যায়। জেট যন্ত্রবিদ্যার ক্রমোন্নতি বর্তমানে এই গ্রহান্তর যাত্রাকে সম্ভব করে তুলেছে।

কয়েক বছর আগে থেকেই সোবিয়েত বৈমানিকেরা আয়নোস্ফিয়ার দিয়ে সুদূরগামী যাত্রীবাহী রকেট বিমানসমূহের নিয়মিত উড্ডয়ন আরম্ভ করে দিয়েছেন। আয়নোস্ফিয়ার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলেরও উর্ধ্বতনস্তর দিয়ে উড্ডয়নের ব্যাপারটা গ্রহান্তর যাত্রার মতই। সেখানেও যা এখানেও সেই রকম উড়বার আগে হঠাৎ অত্যধিক ভারগ্রস্ত হওয়া এবং মাঝপথে আকর্ষণহীনতার অবস্থা। সেখানেও যা এখানেও সেই রকম প্রায় সম্পূর্ণ শূন্যতা, আলট্রাভায়োলেট এবং কস্‌মিক রশ্মিগুলি এখানেও মোটেই কম শক্তিশালী নয়। তাই শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের কর্মীরা আয়নোস্ফিয়ার দিয়ে উড়ো-জাহাজে করে বেশ কয়েকবার মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্তক এবং পিকিং, এমন কি দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত যে আকাশযাত্রা করেছিল, তা বৃথা যায়নি। অবশ্য পথে নানারকম আকস্মিক ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন বাধার সম্মুখীন আমরা হব না বলেই মনে হয়। গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যের সঙ্গে

বিজ্ঞান বেশ ভালভাবেই পরিচিত হয়েছে; বহু বছর আগে থেকেই বৈজ্ঞানিকরা ওখান থেকে তাঁদের "সহকারী"দের রেডিওগ্রাম পাচ্ছেন। সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে সব কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাশূন্যে পাঠিয়েছে, সেইগুলোতে যে সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আছে আমি 'সহকারী' বলতে আমি তাদেরই কথা বলছিলাম। আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় এদের দেখেছেন দূরবীন দিয়ে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায়। সবচেয়ে সহজে এদের দেখতে পাওয়া যায় গোধূলির সময় কিংবা ভোর সকালে; নক্ষত্রের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলো আকাশের এমাথা থেকে ওমাথায় ছুটে চলে যেতে থাকে।

পৃথিবী থেকে চাঁদে যাত্রাও হয়েছে সত্যি—কিন্তু তা হয়েছে স্বয়ংচালিত যাত্রীবিহীন রকেটে। আপনাদের মনে থাকতে পারে প্রথম রকেটটির আকাশযাত্রা সফল হয়নি। ইলেকট্রনিক রেগুলেটারের ভুলে সময় হওয়ার আগেই এঞ্জিন থেমে গিয়েছিল এবং রকেটটি চাঁদ পর্যন্ত যেতে পারেনি। কেন যে রেগুলেটারটি রাস্তার মধ্যে খারাপ হয়ে গেল তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। রকেটটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসেনি, ওটা পৃথিবীর একটা উপগ্রহ হয়েই রয়ে গেল এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দুঃখের বিষয় এই "আকস্মিক" উপগ্রহটি বিজ্ঞানের বিশেষ কোন কাজে না লেগেই গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে চলে বেড়াচ্ছে। রকেটের ওজন কমানোর উদ্দেশ্য থাকায় আমরা এটাতে কোনো

যন্ত্রপাতি বসাইনি, নয়তো এটা আমাদের অনেক মূল্যবান খবর জোগাতে পারত।

দ্বিতীয় স্বয়ংক্রিয় রকেটটি চাঁদে গিয়ে নেমেছিল "টলেমি" আগ্নেয়গিরির কাছে। এই যাত্রায় রেডিও-টেলিকণ্ট্রোল অর্থাৎ বেতারযোগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি খুব ভাল ভাবেই কাজ করেছে। আমাদের রেডিও এঞ্জিনিয়ারেরা রকেটটিকে চাঁদ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে সেখানে নামাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পরের রকেটগুলি—তৃতীয় ও চতুর্থটিই আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজ দিয়েছে। এর মধ্যে একটি রকেট চাঁদের চতুর্দিকে ঘুরে এসে স্বয়ংচালিত যন্ত্রে গৃহীত একটি সিনেমাছবি নিয়ে এসেছিল পৃথিবীতে। মানুষ এতেই সর্বপ্রথম চাঁদের উল্টোপিঠটা দেখতে পেল। চতুর্থ রকেটটাকে এমন সব রেডিও যন্ত্রপাতি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যেগুলি আমাদের খবর পাঠিয়েছিল চাঁদের প্রকৃতি সম্বন্ধে। তারই সঙ্গে আমাদের অবতরণের জায়গাটিও এই রকেটই ঠিক করে এসেছিল।

এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক হয়েছে পথ, আর এখন সেই পথেই যাত্রা করছে মানুষ। বিমানে থাকব আমরা চারজন। দুঃখের বিষয় কোনমতেই যাত্রীসংখ্যা আর বাড়ানো সম্ভব নয়। এ চারজনের ব্যবস্থা করার জন্যেই নির্মাণবিদদের সঙ্গে আমাদের বহু লড়াই করতে হয়েছে। তাঁরা জেদ ধরেছিলেন যাতে তিনজনের বেশি না যায়। নির্মাণবিদের পক্ষে এত কৃপণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি এক কিলোগ্রাম ভার বস্তুর জন্য আমাদের লাগবে ৮০ কিলোগ্রাম জালানি, আর যন্ত্রপাতি, এঞ্জিন নিয়ে বিমানদেহের ওজন বাড়বে ৯ কিলোগ্রাম। এবার হিসেব করতে চেষ্টা করুন—মজুত খাদ্য, পানীয় এবং বাতাস সহ মাত্র একজন লোককে নিয়ে যেতে কত কিলোগ্রাম ওজন বাড়াতে হবে।

যাত্রীদের সংখ্যাল্পতার ফলে এমন লোক প্রয়োজন হয়ে পড়ল যাতে একই লোকের বিভিন্ন কাজের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। আমাদের প্রতিটি লোকের উপরই দায়িত্ব থাকবে অনেকগুলি। এঞ্জিনিয়ার তামারিন এঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ করবেন, যন্ত্রপাতির উপর নজর রাখবেন, মেরামত ইত্যাদি করবেন। আমাদের বৈমানিক সোকোলফ হলেন একই সঙ্গে রেডিও অপারেটর, ম্যাপ অঙ্কনবিদ, অংশত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ এবং এ ছাড়া চলচ্চিত্রগ্রাহকও। ডাক্তার আকোনিয়ানের দায়িত্ব হল জীবতাত্ত্বিক এবং শারীরতাত্ত্বিক গবেষণা। তাঁর উপর আরেকটা খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ বর্তিয়েছে। তিনি হলেন আমাদের বিমানের প্রধান পাচক। তার কর্তৃত্বে রয়েছে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বিশ্রাম, নিশ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা. এক কথায় স্বাস্থ্য এবং জীবন। আমি করব জ্যোতিবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার পরীক্ষা, চাঁদের খনিজ এবং প্রস্তর সংগ্রহ। আমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেখানকার প্রায় অপরিচিত ভূতত্ত্বকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এসব ছাড়াও যাত্রায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা প্রত্যেকে বিমানটিকে

নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে। এসবে সময় লেগেছে। যাত্রার জন্য জরুরি প্রস্তুতি, বিশেষ শিক্ষা, প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম বাছাই এবং যন্ত্রপাতির পরীক্ষায় বছরের বেশির ভাগটাই কেটে গেল।

শেষে আমাদের পরিকল্পনার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাক। তুদিনের মধ্যেই আমরা চাঁদে গিয়ে অবতরণ করব একটা জায়গায় যার নাম দেওয়া হয়েছে 'বৃষ্টিসাগর'। এই বিস্তীর্ণ, প্রায় সমতল সম্পূর্ণ শুষ্ক কাল্পনিক সমুদ্রটি অবতরণের পক্ষে খুবই উপযোগী এবং শেষ স্বয়ংচালিত রকেটের দ্বারা পর্যবেক্ষিত। আমরা চেষ্টা করব এটাকে খুঁজে বের করতে এবং স্বয়ংচালিত রেকর্ড করার যন্ত্রগুলিতে ধরে নিতে। "বৃষ্টিসাগর" চাঁদের নিরক্ষরেখা থেকে মেরুদেশের অর্ধেক পথে ঠিক মধ্য অক্ষাংশটিতে অবস্থিত। চাঁদের নিরক্ষরেখার তুলনায় উত্তাপ ওখানে অনেক কম, নিরক্ষরেখার উত্তাপ ১০০° সেন্টিগ্রেডকে ছাড়িয়ে যায়।

চাঁদে আমরা পৃথিবীর হিসেবে দশদিনের মতো থাকব। পৃথিবীর একদিন চাঁদের একদিনের থেকে অনেক ছোট; চাঁদের ১টি দিন পৃথিবীর হিসেবে ১৪ দিন ধরে চলে—এ তো জানাই আছে। আমরা 'বৃষ্টিসাগরে' পৌঁছব—যখন ওখানে সবে সকাল শুরু হয়েছে আর রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে আসব চাঁদ। আরো বেশিদিন চাঁদে থাকা এবং চৌদ্দ দিন ধরে প্রায় –১৫০° ডিগ্রীর জমাটবাঁধা ঠাণ্ডায় চাঁদের একটি রাত্রি যাপন করবার জন্য অপেক্ষা করে থাকা খুবই

কষ্টকর ব্যাপার। এই রাত্রিযাপনের জন্য দরকার হবে আরো অতিরিক্ত খাদ্য, বাতাস ও জালানি। অবশ্য আরো কষ্টকর হলো চাঁদের ঐ উল্টোদিকটাতে যাওয়া। তাই এই প্রথমবারে চাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের পালাটা অল্প সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব এবং ৭ই ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় যখন "বৃষ্টিসাগরে" সুদীর্ঘ কালোছায়া এসে পড়বে তার একটু আগেই আমরা ফেরবার পথ ধরব।

কিন্তু চাঁদের রাত্রির সঙ্গে আমাদের মোটামুটি কিছুটা পরিচয় হবেই। ২৯শে নভেম্বর যখন আমরা চাঁদে থাকব তখন একটা পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ঘটবে। পৃথিবীর পক্ষে এ হবে চন্দ্রগ্রহণ আর চাঁদের পক্ষে এ হবে সূর্যগ্রহণ। এই ব্যাপারটা চাঁদে দেখতে হবে অপূর্ব। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্যরশ্মি গিয়ে পৌঁছবে পৃথিবীতে। প্রচণ্ড জ্বালা-ধরানো উত্তাপ চলে গিয়ে তখন এসে পড়বে জমাট-বাঁধানো শীত।

পৃথিবীতে ফিরে আসব ৯ই ডিসেম্বর। আমরা অবতরণ করব কোথায়? এ প্রশ্নটার সমাধান অনেক আগেই করা হয়ে গেছে। "চাঁদ—১" অবতরণ করবে ৎসিম্‌লিয়ান্‌স্কি সাগরে। যদি ততদিনে ওটা জমে যায় তবে আমাদের তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে, তখন আমরা যাব আরল সাগরে। সাগরে এরোড্রোমের মতই প্রচুর সুবিধা। প্রথম হল, জলের মধ্যে অবতরণ করার জন্য চাকা কিংবা তার কাঠামোর দরকার নেই। ফলে বিমানটা একটা অদরকারী বোঝার হাত থেকে বাঁচল। এছাড়া ৎসিম্‌লিয়ানস্কি

সাগর যথেষ্ট বড় হওয়ায় নামবার সময় খুব নিখুঁত হিসাব করে না নামলেও চলবে। কেবিনসহ বিমানটি বাতাসে পরিপূর্ণ থাকবে এবং ট্যাঙ্কগুলি থাকবে জ্বালানিশূন্য—কাজেই বিমানটা নিশ্চয়ই ডুবে যাবে না। বিশেষ বিশেষ স্টীমারে নজর রাখতে থাকবে যাতে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি তীরে পৌঁছে দিতে পারে। তখন আপনারা আমাদের কাছে চাঁদের বিস্তারিত গল্প শুনতে পাবেন।

রেডিওর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক মহাজাগতিক রকেট ইন্‌ষ্টিট্যুটের ডিরেক্টর

আ, আ, কিরিয়েফ্‌

অজানা দেশে বেরিয়ে পড়ে অভিযাত্রীদের অদৃষ্টপূর্ব নানা বাধার সম্মুখীন নিশ্চয়ই হতে হয়। তাতে হয় তাদের ফিরে আসতে হয়, নয়তো অপ্রস্তুতির ফলে তাদের বিপদগ্রস্ত হতে হয়। যে সেনাবাহিনী চরের কাছ থেকে পূর্বাহ্ণে সংবাদ না নিয়ে অগ্রসর হয় তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। স্বয়ংক্রিয় রকেটগুলি মহাশূন্যে এই চরের ভূমিকাই পালন করেছে।

বিমানবিদ্যার যুগে বিমানবিদ্যা ক্রমোন্নতি লাভ করেছে পূর্বসংবাদাদি ছাড়াই; মানুষ তাড়াহুড়ো করে উঠে গিয়েছে অজানা আকাশে; ফলে তাদের অনেককেই জীবন দিয়ে সেই দুঃসাহসী প্রচেষ্টার মূল্য দিতে হয়েছে। তারপর রুশ বিমান-বিদ্যার জন্মদাতা নিকোলাই ইয়েগোরোভিচ্‌ জুকভ্‌স্কি তৈরি করলেন এক 'এরো-ডাইনামিক্যাল টিউব'। এই 'টিউব' বা

নলটি বহু পরীক্ষাকারী বৈমানিকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। নির্মাণের পর বিমানের মডেলের দোষত্রুটিগুলি এর দ্বারা যাচাই করা যেত। দুঃখের বিষয়, মহাকাশ যাত্রার ব্যাপারে 'এরো-ডাইনামিক্যাল টিউবের' মত কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। টিউবের পরিবর্তে বহু স্বয়ংক্রিয় রেডিও নিয়ন্ত্রিত রকেট পাঠিয়ে আমরা গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে পরীক্ষা চালিয়েছি।

এই রকেটগুলির আকাশযাত্রার দ্বারা গ্রহান্তর গমন-বিদ্যার একটা নতুন পর্যায় গড়ে উঠল। এই পর্যায়টি কনস্তান্তিন্ এদুয়ার্দোভিচ্ ৎসিওল্‌কভস্কির পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। এটা অস্বাভাবিক নয়। ৎসিওল্‌কভস্কি যখন গ্রহান্তর গমনবিদ্যার উদ্ভাবন করেন, তখন রেডিও সবেমাত্র শৈশবকাল কাটিয়ে উঠছে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দী এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন অসম্ভব দ্রুতগতিতে রেডিওর উন্নতি হতে লাগল। বার হতে থাকল রেডিও টেলিগ্রাম, উত্তর মেরুর শিবিরের সঙ্গে রেডিও-আলাপন, ফটো-চিঠি, রঙীন এবং সাদা-কালো টেলিভিশন, টেলিভিশন্ লাগানো টেলিফোন যাতে যারা কথা বলছে তাদের দেখতে পাওয়া যাবে, ক্ষুদ্র রেডিও-ফটো সংবাদপত্র, গ্রাহকদের নিজের বাড়িতেই ছেপে যাওয়া সংবাদপত্র ইত্যাদি।

রেডিও-সংযোগ, রাডার, রেডিও-নেভিগেশন বা রেডিও সংযুক্ত নৌচালনা, টেলিভিশন্, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিদ্যা এবং টেলি-মেকানিক্স্, ইলেকট্রনিক্স্, ইলেক্ট্রোটেক্‌নিক্যাল এবং স্বয়ংক্রিয়

যন্ত্রাদি এবং সবশেষে যন্ত্রবিদ্যার আধুনিকতম ক্ষেত্র রেডিও টেলি-কণ্ট্রোল বা রেডিও সংযোগে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা—এইসব ছাড়া এখনকার যন্ত্রবিদ্যাকে তো চিন্তাই করা যায় না।

গ্রহান্তর গমনবিদ্যার সমস্যাগুলির সমাধানে এসবগুলিরই ভূমিকা খুব বড়।

প্রথম স্বয়ংক্রিয় রকেট আবির্ভূত হয়েছিল ২০ বৎসর আগে। এগুলি ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পার হয়ে গিয়ে আয়নোস্ফিয়ারের একেবারে নিচের স্তরে উঠে গিয়েছিল। এদের সঙ্গে লাগানো যন্ত্রপাতিগুলি রেডিওযোগে খবর পাঠিয়েছে তাপমাত্রা, বহু উর্ধ্বের চাপ, মহাজাগতিক রশ্মি এবং সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি যা বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে পারে না—এইসব সম্বন্ধে।

প্রথমদিকের এই সমস্ত স্বয়ংক্রিয় রকেটগুলি সেকেণ্ডে ২ থেকে ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ অর্জন করেছিল। এবং শেষকালে সেকেণ্ডে ৭.৯ কিলোমিটার কি তারও বেশি গতিবেগ অর্জিত হয়েছিল। এই রকমই গতিবেগযুক্ত একটা রকেটকে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যে। সেটা এখনো পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারেনি, সেটা এখনও ভূমণ্ডলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করছে। কয়েকটি পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের পর বৈজ্ঞানিকরা স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহ "আ-স-১" নির্মাণে সক্ষম হলেন।

এই উপগ্রহটিকে ১নং মহাজাগতিক বীক্ষণাগারও বলা হয়ে থাকে এবং এখনো এটি পৃথিবী সমীপবর্তী মহা-শূন্যে রয়েছে। সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই

মহাজাগতিক বীক্ষণাগারের পার্থক্য হলো এই যে, এর চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানকর্মীরা কাজ করে না, কাজ করে এর থেকে কয়েক সহস্র কিলোমিটার দূরে পৃথিবীতে বসে। উপগ্রহটির সঙ্গে যেসব যন্ত্র সংযুক্ত আছে সেই যন্ত্র-গুলিই রেডিও সহযোগে বৈজ্ঞানিকদের সংবাদ প্রেরণ করে সৌরবিকীরণ, মহাজাগতিক রশ্মি, পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর শক্তি এবং দিকনির্দেশ সম্বন্ধে। এই সমস্ত খবরগুলি একটি চৌম্বক ফিতার উপর লেখা হয়ে যায়। উপগ্রহটি মস্কোর উপর দিয়ে যাবার সময় বীক্ষণাগারের বিজ্ঞানকর্মীরা সেইসব লেখাগুলির অর্থোদ্ধার করতে থাকেন এবং ফলাফলগুলি থেকে সাধারণ সূত্র বার করতে আরম্ভ করেন।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিগুলি গত কুড়ি বৎসর ধরে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার—এই বহুবর্ষব্যাপী বেতারবার্তা প্রেরণের 'শক্তি' এরা কোথা থেকে পেল? এর উত্তর খুবই সোজা। সূর্যই এই শক্তি জোগায়। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই আমাদের বৈজ্ঞানিকরা এমন একটি যন্ত্র বানিয়েছিলেন যা আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। এই ট্রানস্‌ফর্মার বা পরিবর্তকটির সাহায্যে একটি অতিসাধারণ কেরোসিন বাতির আলো দ্বারাই রেডিও রিসিভিং সেট বা বেতারগ্রাহক যন্ত্রকে চালান যেতে পারত। শত্রুপক্ষের বহু পশ্চাতের গেরিলা দলগুলির দ্বারা এটি প্রায়ই ব্যবহৃত হত। উপগ্রহটিতে একটি বিশেষ ফটো ইলেকট্রিক্ ব্যবস্থা দ্বারা ট্রানস্‌ফর্মারটিকে সমস্ত

সময়েই সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে রাখা যাবে। রকেটটি যতক্ষণ সূর্যের আলো পাবে ট্রানস্ফর্মারটি ততক্ষণ সমস্ত যন্ত্রপাতি-গুলিকে শক্তি জুগিয়ে যাবে এবং এ ছাড়াও একটি এ্যাকুমুলেটর বা সংগ্রাহককে চার্জ বা বিদ্যুতায়িত করে যাবে। উপগ্রহটি যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে পড়ে যাবে তখন অ্যাকুমুলেটরটির অর্জিত শক্তি দিয়ে কাজ হতে থাকবে।

বিশেষ কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ইলেকট্রোলাইটের ঘনত্বকে এবং ট্রানস্ফর্মার অ্যাকুমুলেটর ইত্যাদির কাজকেও নিয়ন্ত্রিত করবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের ওজন থাকবে না। এই ওজনহীনতা নির্মাণবিদদের মুস্কিলে ফেলেছিল। কিন্তু সে মুস্কিল অতিক্রম করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য ইলেকট্রনিক ল্যাম্প-এর বদলে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল ক্রিষ্ট্যাল ল্যাম্প যা অনেক টেঁকসই। কিন্তু কোন না কোন সময়ে এই ল্যাম্পগুলিও ফুরিয়ে যাবে। সেইজন্যে বছরে একবার পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে ল্যাম্পগুলির স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে নিতে হয়।

প্রথম স্বয়ংচালিত উপগ্রহ 'আ, স—১' কে অনুসরণ করে 'আ, স—২' এবং তারপর 'আ, স—৩' ও যাত্রা করে গেল। সবগুলির চেয়ে বড় "লুন" রইল পৃথিবীতেই। এখনকার উপগ্রহগুলির নম্বর বেড়ে দুই সংখ্যায় হয়ে যাচ্ছে। চৌম্বক ফিতায় লিখিত এদের রিপোর্টগুলি আমাদের মহাজাগতিক রকেট ইনষ্টিট্যুটে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

মহাজাগতিক রকেট ইনৃষ্টিট্যুটের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সব কিছুই এখন হচ্ছে কেবল মহাজাগতিক মহাশূন্যের সমস্যাটির পর্যালোচনা নিয়েই। সমস্ত কিছুই একসঙ্গে তো আর করা যায় না।

স্বয়ংচালিত উপগ্রহগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বেতার সংযোগের ফলে সূর্য, পৃথিবী, মহাজাগতিক রশ্মি, ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবীর চৌম্বকত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে কত বৈজ্ঞানিক অনুমান গড়ে উঠল এবং কত অনুমান ধামা চাপা পড়ল! কত নতুন তথ্য পাওয়া গেল। খুলে গেল প্রাকৃতিক জ্ঞানের কত নতুন পথ।

পৃথিবীর ছায়ার নিম্নউত্তাপের মধ্যে এবং সূর্যের কিরণের সোজাসুজি নিচে বিভিন্ন পদার্থকে পর্যালোচনা করা হোল 'আ, স—২' এর মধ্যে দিয়ে। 'আ, স—৩' এর সঙ্গে শূন্য-যাত্রায় পাঠানো হল প্রথম জীবিত প্রাণী –কয়েকটি বানর। ওদের শরীরের সঙ্গে বাঁধা যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তা দিয়ে তাপমাত্রা আর রক্তের চাপ মাপা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে রক্ত, আর তোলা হয়েছে ইলেক্ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম। আর এই সব খবরই বেতার মারফৎ চলে এসেছে পৃথিবীতে। এ ছাড়াও বিশেষ টেলিভিসন প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে বানরগুলি কিরকম থাকে এবং ওজনহীনতার সঙ্গে নিজেদের কিভাবে খাপ খাইয়ে নেয় তা লক্ষ্য করবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য মহাশূন্যের এই প্রথম ভ্রমণকারীরা অল্পদিন আগেই মারা গিয়েছে, কিন্তু নিজেদের মৃত্যু দিয়ে তারা বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে ভবিষ্যৎ গ্রহান্তরগামী

যাত্রীদের স্বাস্থ্য এবং সম্ভবত জীবনও। প্রাণীগুলির উপর পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহান্তরগামী বিমানের কেবিন, গ্রহান্তরগামী যাত্রীদের পোশাক ইত্যাদির সঠিক পরিকল্পনার উপযোগী অনেক বিষয় পাওয়া গেল। মহাশূন্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবার কাজে অনেক কিছু সাহায্য পেল মানুষ।

পরবর্তী উপগ্রহগুলির অন্যতম "আ-স-৬" কে ৩৫০০০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি উঁচুতে পাঠিয়ে দেওয়া হল এক সুদূর কক্ষপথে। একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করতে এর লাগে ২৪ ঘণ্টা, নিজের মেরুদণ্ডের উপর আবর্তনে পৃথিবীর যতক্ষণ লাগে, ঠিক ততক্ষণই। এই রকম একটা "২৪ ঘণ্টাওয়ালা" উপগ্রহকে এমন জায়গায় অবস্থান করান যায় যাতে সেটাকে একটা বিন্দুর মত মনে হয়—এই যেমন কোনো শহর কিংবা দ্বীপের উপরে আটকানো আছে—কিন্তু সেটা নিরক্ষরেখার উপর হওয়া চাই। আমরা আমাদের "আ-স-৬" কে "ঝুলিয়ে রেখেছি" ভারত মহাসাগরের উপর উরালের দ্রাঘিমা রেখায়। সেখান থেকে—সেই ৩৫০০০ হাজার কিলোমিটারের উচ্চতা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সমস্ত ভূভাগটি। এইজন্য "আ-স-৬" উপগ্রহটিতে বসানো আছে টেলিভিসন্ প্রেরক ক্যামেরা। তার সাহায্যে আকাশের বস্তুপিণ্ডের গতিবিধি দেখার ও পর্যালোচনা করার সুযোগ আমরা পাব এবং সুযোগ পাব আমাদের দেশের উপরকার মেঘলা অবস্থা পরিমাপ করতে।

টেলিভিসনের কাজ হয় 'আলট্রাশর্ট' অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র-দৈর্ঘের বেতার তরঙ্গের সাহায্যে। এই তরঙ্গগুলি যে সরলরেখায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করতে পারে না এটা সকলেই জানে। এই বিষয়েই "আ-স-৬" উপগ্রহ আমাদের সাহায্য করেছে। এই উপগ্রহের বেতার গ্রাহক এবং প্রেরক ব্যবস্থা দ্বারা মস্কো, লেনিনগ্রাদ এবং কিয়েভের টেলিভিসন প্রোগ্রামগুলি একেবারে বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত দেশময় রিলে করা যায়।

এই সমস্ত বড় বড় পরীক্ষামূলক বিষয়গুলি থেকেই ক্রমে অভিযানের জটিলতর সমস্যাগুলির সমাধানের পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পাওয়া গেল।

এই সময়েই গ্রহান্তর গমনের ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রবিদ্-বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে গিয়ে থামবার জায়গা কোথায় হবে সেই প্রশ্ন তুলে তুমুল বিতর্ক চালিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের নানা অভিমত দেখা দিল। জনকয়েক মাথাগরম লোক চাঁদের প্রাকৃতিক অবস্থা, গ্রহান্তরগামী বিমানের অবতরণ এবং আকাশযাত্রার সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের জন্য অপেক্ষা না করেই যাত্রীসহ যাত্রার জন্য বিমানের পরিকল্পনার প্রস্তাব করে বসলো।

কিন্তু রেডিও-টেলি-কণ্ট্রোলের সম্ভাবনা এবং সাফল্য সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা এই অভিমত জানালেন যে এখন রেডিও নিয়ন্ত্রিত যাত্রীবিহীন কয়েকটি রকেট পাঠানোরই বেশি প্রয়োজন। তাঁরা বললেন যে এইসব রকেটের দ্বারা সংগৃহীত

তথ্যাদি ভবিষ্যৎ যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

এসব ছাড়াও, স্বয়ংচালিত রকেট অপেক্ষা যাত্রীসহ রকেট পাঠানো অনেক বেশি অসুবিধাজনক। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির জন্য খাদ্য, পানীয় ও বাতাসের দরকার নেই এবং দরকার নেই বিশেষ আচ্ছাদনের। যন্ত্রগুলি খুব সহজেই প্রচণ্ড গরম আর জমাট বাঁধা ঠাণ্ডাকেও সহ্য করতে পারে। এমন কি যদি কোন আকস্মিক উল্কাপিণ্ড কোন একটা রকেটকে ক্ষতিগ্রস্তও করে তাহলেও সেই রকেটের যন্ত্রপাতিই শুধু নষ্ট হবে, অন্য রকেটগুলো উড়ে চলে যাবে লক্ষ্যে এবং তাদের কাজ করে যাবে। এসব কিছুর চেয়ে বড় কথা—স্বয়ংচালিত রকেটের পৃথিবীতে ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা নেই। অর্থাৎ ফিরবার পথে চাঁদ থেকে ওরা যাত্রা শুরু করতে বা থেমে গিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসতে যে জালানি খরচ করবার দরকার হবে, তা স্বয়ংচালিত রকেটের দরকার নেই।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ও উড্ডয়নক্ষেত্র কোথায় হতে পারে এবং পৃথিবীতে অবতরণস্থলও কোথায় হতে পারে তা নির্ধারণ করার কাজটি স্বয়ংচালিত রকেটের সাহায্যে সমাপ্ত করে রাখা দরকার। বৈজ্ঞানিকরা ট্র্যাজেকটরী বা মহাশূন্য ভ্রমণপথের বক্রতলতা সঠিকভাবে হিসেব করে দেখেছেন কিনা, সূর্য এবং গ্রহগুলির আকর্ষণের প্রভাব সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও জানা দরকার। যাত্রীসহ রকেট বিমানের

পরিকল্পনার জন্য কি রকম সাজসরঞ্জাম দরকার এবং রক্ষাকারী পোশাকই বা কিভাবে তৈরি করতে হবে তার তথ্য শুধু মাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা পাওয়া যেত না।

এতসব সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে কি ভাবে? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বলেই তো আর তা মানুষের বুদ্ধির মত কাজ করতে পারে না। আমাদের দরকার হচ্ছে এমন ব্যবস্থা করা যাতে চাঁদে মানুষ না পাঠিয়েও এমনভাবে একটা 'পর্যবেক্ষক' বসানো যায়, যাতে মনে হবে সে চাঁদে গিয়ে ঘুরে এসেছে এবং নিজের চোখে সবকিছু দেখে এসেছে।

এই ব্যবস্থাকে প্রথমে অসম্ভব মনে হলেও সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল রেডিও-টেলি-কণ্ট্রোল ব্যবস্থার সাফল্যের ফলে।

প্রস্তাব করা হল যে মানুষের পরিবর্তে চাঁদে পাঠানো হোক পৃথিবী থেকে রেডিও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ট্যাঙ্ককে।

খুব তাড়াতাড়ি এই ট্যাঙ্ক তৈরি করা হল। মস্কোর বহু বাসিন্দাই শহরের রাস্তায় এই ভবিষ্যৎ চাঁদের যাত্রীটির সাক্ষাৎ পেয়েছে। ট্যাঙ্কটির অদ্ভুত আকৃতি এবং যন্ত্রপাতি দেখে সকলেরই বিস্ময় হয়েছে। কিন্তু আমাদের ইন্‌ষ্টিট্যুটের নির্মাণ-বিদেরা তাঁদের উদ্ভাবিত বস্তুটি সম্পর্কে কোন কথাই কাউকে জানতে দেননি। এটির চাঁদে অবতরণ সম্বন্ধে যাতে কাগজে কিছু না লেখা হয় সেজন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল। চাঁদে যাত্রার সময় এবং চাঁদে অবতরণের সময় রকেটের রেডিওর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থাগুলি আমাদের ইন্‌ষ্টিট্যুটেই করা হয়েছে। তরল অক্সিজেন মিশ্রিত কেরোসিনে কাজ

করে এমন গ্যাস টার্বাইন প্রকৃতির এঞ্জিনই ট্যাঙ্কটির জন্য ঠিক করা হয়েছিল।

ট্যাঙ্কটির সঙ্গে লাগানো ছিল এমন একটা এরিয়্যাল যেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পৃথিবীতে বার্তা পাঠাত। সামনের দিকে একটা আড়াআড়ি দণ্ডের সঙ্গে লাগানো ছিল পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রিত করা একটা টেলিভিসন্ প্রেরক ক্যামেরা। এটা এমন ভাবে সবদিকেই ঘুরতে পারে যাতে পৃথিবীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের পক্ষে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়—টাঙ্কটির সামনে, পেছনে এবং দুই ধারে চাঁদে কি কি জিনিস আছে।

জিরাফের নোয়ানো গলার মতই এই দণ্ডটা ঝুঁকে পড়তে পারে এবং প্রেরক ক্যামেরাটিকে নিয়ে আসতে পারে চাঁদের

পিঠের একেবারে কাছে। এই জন্যই পৃথিবীর পর্যবেক্ষকের পক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের সমস্ত খুঁটিনাটি জানা সম্ভব হয়েছিল। এটা যে শুধু বিজ্ঞানের দিক দিয়েই দরকার হয়েছিল তাই নয়, যাতে চাঁদে গিয়ে নিরাপদ পথ বেছে নেওয়া যায় এবং সময়মত নজর করে বাধাবিপত্তি এড়ানো যায় তার জন্যও এইসব জানা দরকার ছিল।

সূর্যরশ্মি এবং চাঁদের আবহাওয়া পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এবং যাতে চাঁদের মাটি নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় সেই জন্যেও ট্যাঙ্কের ভিতরে বসানো হয়েছিল জটিল সব পরিমাপ যন্ত্র। যন্ত্রাদির দ্বারা সংগৃহীত এই সমস্ত খবরই বিশেষভাবে স্থাপিত রেডিও যোগাযোগ দ্বারা পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল।

তারপর সেই দিন এল, যেদিনকে মানুষের বুদ্ধির বিরাট বিজয়ের দিন বলা যায়। স্বয়ংক্রিয় রকেট "স্ব-র-৪" সাফল্যজনক ভাবে চাঁদে অবতরণ সম্পূর্ণ করল এবং সেখানে পৌঁছে ট্যাঙ্কটি "বৃষ্টিসাগরে" তার ভ্রমণ আরম্ভ করল।

মানুষ এখনো চাঁদে পৌঁছয়নি কিন্তু তার প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রপাতি তাকে চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত টেলিভিশন-দর্শকই চাঁদকে তারিফ করেছে। চাঁদ থেকে সেই প্রথম বেতার দৃশ্য প্রেরণ নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে; মনে আছে তোমাদের ঘরের টেলিভিশনের পর্দায় কেমন করে ফুটে উঠেছে দাঁত বার্-করা আংটার মত সব পাহাড়, অন্ধকার সমতল ভূভাগ, লম্বা লম্বা ফাটল;—চাঁদের নিসর্গ চিত্র

আমাদের কাছে কত অচেনা আর অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।

কিন্তু ছোট্ট একটি রচনায় ট্যাঙ্কটি চাঁদে গিয়ে কি করল তার ফলাফলের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই বিষয় নিয়ে পাঠকের সঙ্গে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

এটা উল্লেখ করা দরকার এই সব রেডিও নিয়ন্ত্রিত রকেটের আকাশযাত্রার ফলে বহু কিছু অজ্ঞাত বিষয় আগে থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং প্রথম গ্রহান্তরগামী বিমানের নির্মাতারা ভালভাবেই জেনে নিয়েছিল গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে এবং চাঁদে অবস্থাটা কি রকম হবে।

এমনি করে যাত্রা করেছিল "স্বয়ংক্রিয়" রকেটগুলি

বিমানক্ষেত্রের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার

ক. দ. সাভেলিয়েফ্

যদি তোমরা কখনো উত্তরদিক থেকে গাড়ি করে মস্কোতে এসে থাক তবে হয়ত তোমরা রাস্তার ডান ধারে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করে থাকবে—একটা ধাতুনির্মিত মিনার জঙ্গলের উপর দিয়ে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। মনে হতে পারে এটা গাছগুলির পিছনে খুব কাছেই রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে অন্তত দশটি কিলোমিটার চলে গেলে তবে তোমরা গিয়ে পড়বে একটা মস্ত মাঠের ধারে, সেই মাঠের মধ্যে দেখতে পাবে বারোতলা বাড়ির সমান উঁচু—এক ধাতব মিনার। এই মাঠের ঐ মিনার থেকেই গ্রহান্তর-গামী বিমান "চাঁদ—১"-এর পূর্ববর্তী স্বয়ংক্রিয় রকেটগুলি যাত্রা করেছিল।

সমস্ত জিনিসপত্র এবং যন্ত্রপাতি এখানে আনা হয়েছিল একটা ছোট শাখা রেলপথ দিয়ে। এরোড্রোম অঞ্চলের সীমানার ধারেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কয়েকটি ঢিবি দেখা যাবে। এগুলো হল ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্ক, রকেটের কাজে লাগে এমন সব বিভিন্ন রকমের জ্বালানি রাখা আছে এখানে—এই যেমন বেন্‌জিন্, অ্যালকোহল, নাইট্রিক অ্যাসিড, তরল অক্সিজেন, ফ্লোরিন এবং আরো অন্যসব।

শূন্যযাত্রার জন্য এঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন রকমের জ্বালানি

পরীক্ষা করে দেখছিলেন। কোন রকেটে একরকম জালানি, অন্য রকেটে আরেক রকম জালানি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই উঁচু ধাতব মিনারটি যে শুধুই যাত্রা শুরু করে দেওয়ার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, নির্মাণ মঞ্চ হিসেবেও এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানেই রকেটটিকে জোড়া লাগানো হয়েছিল, এখান থেকেই সেটা যাত্রা করেছিল তার পথে। এই অতিকায় খাড়া কাঠামোটি উঠে গিয়েছে ৫০ মিটার উপরে। যে সুদীর্ঘ রকেটটিকে তৈরি করা হচ্ছে সেটা এর ভেতরেই বসানো রয়েছে। রকেটটিকে তার পুচ্ছভাগের জন্য একটা প্রকাণ্ড তীরের মত লাগে দেখতে। আয়তনে এটি মিনারটির চেয়ে খুব বেশি ছোট নয়। এই তীরটির চতুর্দিকে বিভিন্ন তলায় নির্মাতারা কাজ করছিলেন। দিনরাত ইলেক্‌ট্রিক্ ওয়েল্ডিং-এর কাজ হচ্ছে আর তা থেকে উজ্জ্বল তারাগুলি ঝলসে পড়ছে; তুরপুন্ চলছে গুন্‌গুন্ শব্দ করে, মোটরের গর্জন হচ্ছে। লিফ্‌টগুলি মিনার বেয়ে ওঠা নামা করছে নিঃশব্দে, কর্মী ও জিনিসপত্র পৌঁছে দিচ্ছে প্রত্যেক তলায়।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে একটানা চলেছিল এই কাজ। তারপর এসে পড়ল যাত্রার চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তটি। (এরোড্রোমে এমনটা কখনো ঘটেনি)। জোড়া লাগানোর জন্য তৈরি মঞ্চটি নিঃশব্দে তার জায়গা থেকে সরে গিয়ে রেল লাইন ধরে একপাশে চলে গেল। মাঠের মাঝখানে রকেটটি পড়ে রইল একলা। সাইরেনের একটানা গোঙানিতে নির্দেশ
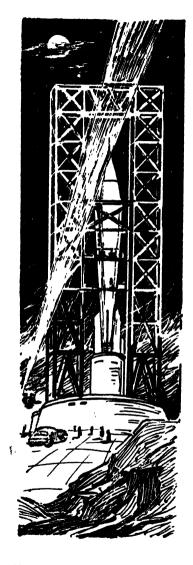
এল মাঠ পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্যে এবং উপযুক্ত আশ্রয় স্থানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। শক্তিশালী ডায়নামোর শব্দ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগল। তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রচণ্ড গর্জন ফেটে পড়ল। পেছনের ফুটোগুলো দিয়ে বেরিয়ে পড়ল লক্‌লকে লাল্‌চে-বেগুনি আগুনের শিখা—রকেটটা ধীরে ধীরে উঠে পড়ল মাটির উপরের মঞ্চ থেকে।

তখনো ককেশাসের গ্রহান্তর স্টেশন হয়নি। এই ব্যয়সাধ্য এবং জটিল যান্ত্রিক নির্মাণকার্যটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত আগে থেকে আমরা করতে পারিনি। গ্রহান্তর্বর্তী মহা-শূন্যে অন্তত গোটা দশেক বিমান উড়ে যাবার পর

আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারলাম রকেট-যাত্রার যে মঞ্চটি করা হয়েছে সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং কম খরচের। কিন্তু রকেটের গতিবেগ অর্জনের দিক দিয়ে সে মঞ্চ কাজের নয়। পূর্ণমাত্রায় জালানি নিয়ে তবেই সেই স্বয়ংক্রিয় রকেটগুলিকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হত। ভার কমানোর জন্যে এবং পথের গোড়ার দিকে সাহায্য করার জন্য মূল রকেটটির সঙ্গে আরেকটি সাহায্যকারী রকেট জুড়ে দিতে হত।

যাত্রারম্ভ করিয়ে দেওয়ার প্রথম কয়েক সেকেণ্ড পর বারুদের এঞ্জিনটি রকেটটাকে চালু করত। এর সঙ্গে সঙ্গেই এরোড্রোমের সবুজ মাঠে এঞ্জিনের মধ্যে জ্বলে উঠত লালচে বেগুনি আগুনের শিখা। বারুদের এঞ্জিনটির কাজ হত মোট কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। এই সময়ের মধ্যেই এটা "স্বয়ংক্রিয় রকেট"কে (ভবিষ্যতে 'স্ব-র' নামে উল্লেখ করা হবে) তুলে ফেলত প্রায় ১ কিলোমিটার উঁচুতে, আর ছুটে যেত সেকেণ্ডে ২৫০ মিটার গতিতে। নিজের কাজ শেষ করে অকেজো বারুদের রকেটটা নিজে নিজেই নিচের দিকে খুলে পড়ে যেত। মস্ত এঞ্জিনটা প্যারাশুটে করে বিস্তীর্ণ এরোড্রোমের উপর নেমে আসত। এই এঞ্জিনটাকে পরের রকেটগুলোতেও ব্যবহার করা যেত।*

যাত্রারম্ভ করার এঞ্জিনটির কাজ যেই বন্ধ হত, অমনি

* ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোবিয়েত দেশ থেকে রকেটের সাহায্যে যে কৃত্রিম চাঁদটিকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল সেটির বেলায়ও প্রায় এই পদ্ধতিই গৃহীত হয়। —অনুবাদক

পরের স্বয়ংক্রিয় এঞ্জিনটির কাজ শুরু হত; এই সময় কিন্তু সেটা লাগানো থাকত তার নিজের রকেটেই। যাত্রারম্ভ করার সমস্ত রকেটগুলিই হচ্ছে বহুস্তরের রকেট; এগুলি তৈরি করা হত পরস্পর সংযুক্ত কয়েক স্তর রকেট দিয়ে। সবার আগে কাজ শুরু হত একেবারে পেছনের, নিচের স্তরের এঞ্জিনটির। প্রথম স্তরে অন্যসব স্তরের মত তরল রকেট-এঞ্জিন বসানো হয়নি, বসানো হয়েছিল হাওয়াই জেট এঞ্জিন। যেখান দিয়ে সাধারণ জেট্ বিমানগুলি উড়ে যায় সেইরকম অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতা পর্যন্তই কাজ করে প্রথম স্তরের এঞ্জিনটি। আর এই সময় এর গতিবেগও থাকে ঐসব বিমানের মতই। এইজন্যই ঐসব বিমানের মতো এঞ্জিনই প্রথম স্তরে বসানো সুবিধাজনক। এই অবস্থায় রকেটগুলির থেকেও এদের জ্বালানির খরচ অনেক বেশি হয়।

হাওয়াই জেট্ এঞ্জিনগুলি রকেটটিকে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন-স্তরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলে গেল, তারপর দ্বিতীয় স্তরের এঞ্জিনগুলির কাজ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় স্তরের এঞ্জিনগুলি তরল রকেট এঞ্জিন। দ্বিতীয় স্তরের পর তৃতীয় স্তরের এঞ্জিন কাজ করত এবং কখনো কখনো চতুর্থ স্তরের এঞ্জিনও দরকার হত। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই চূড়ান্ত স্তরেই রকেটটি প্রয়োজনীয় মহাজাগতিক গতিবেগ অর্জন করত।

যাই হোক, এই চতুর্থ স্তরটিই সবসময়ে যে চূড়ান্ত স্তর হয়ে যায় তা নয়। যে রকেটকে চাঁদে অবতরণ করতে হবে তাতে আরো একটা স্তরের দরকার। কেননা, চাঁদে

অবতরণের আগেই এই এঞ্জিনের গতিবেগ বন্ধ করে দিতে হত।

এমনি করেই যাত্রা করেছিল স্বয়ংক্রিয় রকেটগুলি। পৃথিবী থেকে চাঁদের পথে নিরাপদেই সেগুলো উড়ে গিয়েছিল। আর এই পথ দিয়েই এখন যাত্রা করছে "চাঁদ—১" বিমানটি।

পিছনের বাধা বিপত্তি

'চাঁদ—১' বিমানের প্রধান নির্মাণবিদ্

ফ, ত, দেস্নিৎসিন্

২৫শে নভেম্বর—আমাদের যাত্রারম্ভের বহু প্রতীক্ষিত দিন। এই দিনটি এল বহু বৎসরের পরিশ্রম ও আর নতুন জিনিস সৃষ্টি করার সাহসের ফলে। এই দিনটিতে পৌছানর জন্য কাজ শুরু হয়েছিল সত্তর বছরেরও আগে থেকে এবং শুরু করেছিলেন কন্স্তান্তিন্ এদুয়ার্দোভিচ্ ৎসিওল্কভ্স্কি।

সমাধা হয়ে যাওয়া কাজগুলোর দিকে আজ একবার তাকাও, দেখবে কতরকমের অভূতপূর্ব বাধা এসে দাঁড়িয়েছিল এই পথে। সত্যি বলতে কি, মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া তো সহজ কথা নয়। পরবর্তী দশকে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, তাপযন্ত্রবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে যে অত্যাশ্চর্য সাফল্য লাভ হয়েছে, তারই ফলে সমস্ত বাধা বিপত্তি এবং বিশেষ করে সবচেয়ে বড় বাধা যে মাধ্যাকর্ষণ, তাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করে চাঁদে কিংবা অন্যান্য গ্রহে যেতে হলে দরকার মাধ্যাকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো গতিবেগ অর্জন করা অর্থাৎ যে গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটারের সমান।

এইরকম একটা প্রচণ্ড গতিবেগ অর্জন করার একমাত্র উপায় হলো—"তরল রকেট এঞ্জিন"।

কিন্তু তরল রকেট এঞ্জিনের সাহায্যে বিমানকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিবেগে চালনা করা খুব সহজ নয়। কারণ অনেকগুলো। গ্রহান্তরগামী বিমানের এঞ্জিনটা খুবই শক্তিশালী হওয়া চাই, তার জন্য এতে দরকার প্রচুর জালানির। এই জালানিগুলো বিমানের ট্যাঙ্কে মজুত রাখতে হবে, আর তার ফলে উড়বার সময় বিমানের ওজন খুবই বেশি হয়ে যাবে। তার জন্যে আবার দরকার এঞ্জিনের শক্তি বাড়ানো এবং তার ফলে আবার জালানির পরিমাণ বেড়ে যাবে। এইরকম ভাবে একটা গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে এসে পড়তে হয়। জালানির পরিমাণ ঠিক করার পর বিমানের ওজন হয়ে যায় বিরাট। এই জালানির আবার একটা বড় অংশই বিশেষ-ভাবে দরকার হয় বিমানকে আরো বেশি জোরে চালানোর জন্যে মজুত করা জালানির জন্যই। তাই বৈজ্ঞানিক এবং কারিগররা বছরের পর বছর ধরে মাথা ঘামিয়েছেন কি করে প্রয়োজনীয় জালানির মজুত কমানো যায়।

শুধু মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে যাবার মতো গতিবেগ অর্জনের জন্য যে পরিমাণ জালানি দরকার, মোট জালানির পরিমাণ

তার থেকেও অনেক বেশি হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের বিমানের কথাই চিন্তা করা যাক। যখন এটা উড়তে থাকবে তখন একে বাতাসের বাধা অতিক্রম করতে হবে;—কিছু পরিমাণ জালানি এতে খরচ হয়ে যাবেই। চাঁদের দিকে বিমানটি যখন খাড়া হয়ে পড়তে থাকবে তখন এঞ্জিনের সাহায্যে একে থামানোর জন্যও বাড়তি জালানির হয়ত দরকার হবে। চাঁদ থেকে উড়বার সময় এবং পৃথিবীতে অবতরণ করার সময় আবার খরচ করতে হবে জালানি। কি পরিমাণ জালানি তাহলে দরকার হবে বলো ত!

বিমানে যতটা জালানি আছে তার সমস্তটাই, অর্থাৎ দু'বার ওড়া এবং দু'বার অবতরণ, বিমানকে থামানো এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে জালানি রাখা হয়েছে, তার সবটাই যদি সেই মাধ্যাকর্ষণমুক্ত বস্তুহীন মহাশূন্যে (এই মহাশূন্যকে ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি বলতেন মুক্ত অঞ্চল) বিমানের গতিবেগের জন্য খরচ করা যেত তাহলে বিমানের গতিবেগ নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিবেগের থেকেও অনেক বেশি হয়ে যেত; সেকেণ্ডে ১২·২ কিলোমিটার বা সেকেণ্ডে ২৩ কিলোমিটারের মত হয়ে যেত। এইরকম গতিবেগ হলেই তাকে আদর্শ গতিবেগ বলা হয়ে থাকে। এ থেকেই দেখা যাচ্ছে চাঁদে যাওয়া এবং চাঁদ থেকে ফিরবার জন্য কতটা জালানি নেওয়া দরকার।

ঠিক কতটা দরকার তা হিসাব করা যাক। ৎসিওল্‌-কভ্‌স্কির ফরমূলা অনুসারে যদি হিসাব করা হয় তাহলেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় কেন ২০-২৫ বছর আগে গ্রহান্তর যাত্রা

অসম্ভব ছিল। তরল রকেট এঞ্জিন থেকে যে গ্যাস বেরুত তখন তার গতিবেগ সেকেণ্ডে তিন কিলোমিটারের বেশি হত না। এই ভিত্তিতে ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির ফরমূলা অনুসারে হিসাব করলে দাঁড়ায় এই যে বিমানের মধ্যেকার ভারবস্তুসহ বিমানটির ওজন যা তার চেয়ে ২১৫০ গুণ বেশি ওজনের জ্বালানি যদি যাত্রার আগে বিমানে মজুত করা যায়, তবেই বিমানটি আদর্শ গতিবেগ অর্জন করতে পারে। এটা অবশ্য ধারণা করাও যায় না। ককেশাসের গ্রহান্তর স্টেশন হওয়ার ফলে ব্যাপারটা কিছুটা সহজ হয়েছে, কারণ এতে আদর্শ গতিবেগ সেকেণ্ডে ২২ কিলোমিটার পর্যন্ত কমানো গিয়েছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে কাজে লাগিয়ে বিমানটি যে গতিবেগ অর্জন করে তার উপর আরো যে তিন কিলোমিটার গতিবেগ দরকার হয়, উড্ডয়ন সেতুর গতিবেগের দ্বারা সেই তিন কিলোমিটার ছাড়া আরও প্রায় ½ কিলোমিটার বেশি গতি পেয়ে যাবে। কিন্তু সেকেণ্ডে ২২ কিলোমিটার গতিবেগ করতেও যে পরিমাণ জ্বালানি দরকার তা বিমানের ওজনকে ১৯০০ গুণ ছাড়িয়ে যাবে।

এই প্রধান সমস্যাটি সমাধানের নানা উপায় আছে, তার মধ্যে একটি উপায় আমরা বেছে নিয়েছিলাম। ৎসিওল্‌কভ্‌স্কি একটা উপায় দেখিয়ে দিলেন—পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যে জ্বালানি যোগানোর স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করা। দ্বিতীয় উপায়—"রকেট ট্রেন" অর্থাৎ সংযুক্ত রকেটের ব্যবহার। গ্রহান্তরগামী বিমানে করে চাঁদে

মানুষ পাঠানোর প্রশ্ন যখন এল তখন এই উপায়গুলির বাধা বিপত্তি কমে এসেছে বটে কিন্তু একেবারে দূর হয়নি।

তৃতীয় পথটা রয়ে গেল: আরো ভালো কোন জালানির খোঁজ করা,—এমন জালানি যা থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসবে তার গতিবেগ হবে আরো বেশি। প্রথম প্রথম আমাদের হতাশ হতেই হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই এখনকার রকেট-যন্ত্রবিদ্যায় ২০ বছর আগের চেয়ে অনেক ভালো জালানির ব্যবহার করা হচ্ছে। এখনকার রকেট বিমানগুলি মোট আধঘণ্টায় উড়ে যাচ্ছে মস্কো থেকে পিকিংএ। এইসব বিমানের এঞ্জিন থেকে যে গ্যাস বার হয় তার গতিবেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেকেণ্ডে ৪ কিংবা ৫ কিলোমিটার। কিন্তু চাঁদে যাওয়ার জন্যে এই গতিবেগও যথেষ্ট নয়; কারণ, এই গতি-বেগের জন্য যে পরিমাণ জালানির দরকার তার ওজন হবে বিমান এবং মালপত্রের ওজনের ১৩১ গুণ বেশি।

এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করল আণবিক-যন্ত্রবিদ্যা। আণবিক-যন্ত্রবিদ্যার নতুন সাফল্য আণবিক রকেট এঞ্জিনের সৃষ্টি সম্ভব করেছে, যে এঞ্জিনের গ্যাসের গতিবেগ হল সেকেণ্ডে দশ কিলোমিটার। সেকেণ্ডে দশ কিলোমিটার গতিবেগ হলে বিমানের মধ্যেকার জালানির ওজন যাত্রী এবং অন্যান্য ভারবস্তু সহ বিমানের নিজস্ব ওজনের ৮ গুণ বেশি হলেই চলে। (সঠিক ভাবে বলতে গেলে এখানে জালানি বলে ধরা হচ্ছে যা দিয়ে কাজ হবে সেই বস্তুটিকে, অর্থাৎ

জগৎকে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হয়েছে আণবিক এঞ্জিন নামক প্রবন্ধে)।

১৯০০ : ১—এই অনুপাতের তুলনায় ৮ : ১—এই অনুপাতে আসাটা একটা বিরাট সাফল্য সন্দেহ নেই। এই সাফল্যই গ্রহান্তর ভ্রমণকে সম্ভব করেছে। কিন্তু খুব সহজে এইরকম বিমান তৈরি করা এবং তাকে সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করা যায়নি ; কারণ এই বিমানের ভেতরের জিনিসপত্রে ওজন যা ছিল তার চেয়ে বিমানটির ওজন ৯ গুণ হাল্কা করতে হয়েছে। (৮ গুণ নয়, ৯ গুণ, কারণ বিমানের ওজনের শতকরা দশ ভাগ হবে প্রয়োজনীয় ভারবস্তুর ওজন)। এই প্রসঙ্গে তোমাদের মনে করিয়ে দিতে পারি যে একটা সাধারণ বালতির ওজন তার জলভরা অবস্থার ৭ গুণ কম। এখানে অনুপাত হল ৭ : ১, আর আমাদের বিমানের ব্যাপারে হল ৯ : ১, তার মানে, যন্ত্রপাতি, এঞ্জিন, সাজসরঞ্জাম, এইসব মিলিয়ে বিমানটির আনুপাতিক ওজন ঐ বালতির অনুপাতের চেয়েও কম হবে।

এই রকম হিসেব মাফিক হাল্কা এবং সেই সঙ্গে টেকসই বিমান তৈরি করা একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যাত্রার সময় "চাঁদ—১" বিমানখানির ওজন হবে আনুমানিক ৪৫০ টন। এর মধ্যে ৪০০ টনের কাছাকাছি হবে জালানির ওজন ; এই জালানি প্রয়োজন হবে প্রধানত আণবিক এঞ্জিনের জন্য (জলের ভাগ), এবং ওড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ডানাগুলোর শেষ মাথায় বসানো তরল রকেট এঞ্জিন

চালানোর জন্য। বাদবাকি ৫০ টনের মধ্যে বিমানের নিজের দেহের, এঞ্জিন এবং ট্যাঙ্কগুলির ওজন ৪৫ টন। বাকি পাঁচ টন হবে প্রয়োজনীয় ভারবস্তু সমস্ত কিছু মিলিয়ে, যার মধ্যে পড়বে যাত্রীদের কেবিনের ওজন, ৪ জন বিমানকর্মী, জনপ্রতি দিনে ১ কিলোগ্রাম হিসাবে (চার জনের মোট ১৫০ কিলোগ্রাম) ৫ সপ্তাহের খাদ্য, সেই পরিমাণ জল, ১ মিটার করে তরল অক্সিজেন (১৪০ কিলোগ্রামেরই কাছাকাছি)। এর সঙ্গে যোগ করে নাও বাসন কোসন, জামা কাপড়, বিশেষ ধরনের সাজপোশাক, ঠাণ্ডা এবং গরম করবার, বাতাস পরিষ্কার রাখবার ও জল শোধন করবার যন্ত্রপাতি, ওষুধের আলমারি, দরকারি কলকব্জা, নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রাদি, রেডিও স্টেশন আর রাডার যন্ত্র, দূরবীন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ সিনেমা এবং ফটো তুলবার যন্ত্রপাতি, বইপত্র, ম্যাপ, চার্ট, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, এবং শারীরবিদ্যার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সাজ-সরঞ্জাম এবং এই সমস্ত যন্ত্রপাতির শক্তি যোগানর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র।

এইবার তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবে সঙ্গে নেবার জিনিস নির্বাচিত করতে আমরা কত সতর্ক হয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় যা তাই শুধু নিয়েছি। আরো বুঝতে পারবে কি প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সামান্য একটু ওজন কমানোরও প্রত্যেকটি সম্ভাবনা আমাদের আলোচনা করতে হয়েছে। তোমরা চিন্তা করে দেখতে পারো—পূর্ব নির্ধারিত তিনজনের বদলে চারজন লোক নিয়ে অভিযাত্রীদল করা যায়

কিনা এইটুকু সম্ভব করার জন্যই আমাদের কিভাবে সমস্ত ব্যবস্থা অদলবদল করতে হয়েছে।

কিন্তু সমস্ত যুক্তি তর্কই এখন শেষ হয়েছে। ২৫শে নভেম্বর "চাঁদ—১" বেরিয়ে পড়ছে তার যাত্রাপথে।

পরমাণবিক এঞ্জিন

"এল" প্রতিষ্ঠানের নির্মাণবিদ দলের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার

ভ, স, ক্রাসাবিন

"চাঁদ—১" বিমানটিতে আণবিক এঞ্জিন বসানো হয়েছে। পরমাণু কেন্দ্রদেশে লুক্কায়িত প্রচণ্ড শক্তি সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের বহন করে নিয়ে যাবে মহাজাগতিক মহাশূন্যে।

বিমানটি কাজবেকের চূড়া থেকে উঠে যাওয়ামাত্র আণবিক এঞ্জিনটির কাজ শুরু হবে। তার আগে পর্যন্ত উড্ডয়ন সেতুর উপর একে চালাবে যাত্রারম্ভ করানোর মঞ্চটির এঞ্জিনগুলি। জ্বালানির খরচ কমাবার জন্য এবং যাত্রাকালের নিরাপত্তার জন্য এরকম করা হবে। আণবিক এঞ্জিনের কাজ করার সময়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বার হতে থাকবে যা মানুষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। অবশ্য বিমানের কর্মীরা বিশেষ ধরনের দেয়ালের আড়ালে নিরাপদেই থাকবেন।

এঞ্জিনটি তৈরি করার পর আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম কি করে একে হাল্কা এবং ছোট করা যায়। আমাদের চেষ্টার ফলে আমাদের এঞ্জিনের ওজন এখন মোট কয়েক টন মাত্র হয়েছে এবং পরিধি হয়েছে দেড় মিটারের কাছাকাছি।

সাধারণ (আণবিক নয়) রকেট এঞ্জিনের মধ্যে প্রজ্বলনের জন্য একটা প্রকোষ্ঠ থাকে আর গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ছিদ্রপথ থাকে। প্রজ্বলন প্রকোষ্ঠের মধ্যে হতে থাকে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আর সেই প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন উত্তপ্ত গ্যাস রকেটটিকে প্রচণ্ড জোরে পেছনদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে ছিদ্রপথ দিয়ে বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে।

আমাদের আণবিক রকেট এঞ্জিনে প্রজ্বলন প্রকোষ্ঠ নেই, তার জায়গায় রয়েছে রিঅ্যাক্টর। প্রতিক্রিয়াটা তার মধ্যেই হতে থাকে কিন্তু সেটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া নয়—নিউ-ক্লিয়ার বা আণবকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া। ট্যাঙ্কগুলি থেকে বেরিয়ে আসে 'ইউরেনিয়াম—২৩৫'এর সল্টের একটা দ্রবণ। প্রত্যেকটি ট্যাঙ্কের মধ্যেই যাতে প্রতিক্রিয়া না ঘটতে পারে

এমনি করেই ট্যাঙ্কগুলি তৈরি করা হয়েছে। কয়েকটা ট্যাঙ্ক থেকে যখন একই সাথে ইউরেনিয়াম আসতে থাকে এবং এর একটা অংশ মিশে যেতে থাকে তখনই শুরু হয় একটার পর একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ আণবিক কেন্দ্রগুলির একটানা ভাঙ্গন। নিউক্লিয়ার বা আণবকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়ার সময় প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ২০ বছর আগের জানা সবচেয়ে তাপ-সহনক্ষম বস্তুও এতে গলে যেত। আমাদের এঞ্জিন কতকগুলি নতুন তাপ সহনক্ষম বস্তু দিয়ে তৈরি। কিন্তু এগুলিরও কাজ হয় শুধু খুব ভাল ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থার জন্য।

আণবিক চুল্লীর উত্তাপ ব্যবহার করা হয় 'সক্রিয় বস্তু-গুলিকে' উত্তপ্ত করার জন্য। 'সক্রিয় বস্তু' হল—যেমন ধরো বাষ্পীয় এঞ্জিনের মধ্যেকার জল। বাষ্পীয় এঞ্জিনের চুল্লীতে কয়লা পুড়তে থাকে, এর ফলে জল বাষ্পে পরিণত হয়ে যন্ত্রটাকে চালাতে থাকে। আমাদের আণবিক চুল্লীতে "পুড়তে থাকবে" ইউরেনিয়াম। এরই শক্তির দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে সক্রিয় বস্তুগুলি (এবং সেই সাথে জলও)। জল উত্তপ্ত হয়ে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া উজ্জ্বল উত্তপ্ত গ্যাস রকেট থেকে বেরিয়ে আসবে সেকেণ্ডে প্রায় ১০ কিলোমিটার গতিতে। কোনো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসের এরকম গতিবেগ হওয়া অসম্ভব। এরকম গ্যাসের গতিবেগের রেকর্ড হল—সেকেণ্ডে ৪ কিংবা ৫ কিলোমিটার।

ইউরেনিয়াম জোগায় শক্তি, অর্থাৎ উত্তাপ ; জল এক্ষেত্রে কোন শক্তি যোগায় না। জল উত্তপ্ত হয়ে পরিণত হয়ে যায় কয়েকটি উষ্ণ গ্যাসে আর ছিটকে বেরিয়ে যেতে থাকে রকেট থেকে। অনেক রকম জালানিই আণবিক এঞ্জিনে 'সক্রিয় বস্তু' হতে পারে ; জল, তরলীকৃত এমোনিয়া এবং আরো অন্যান্য জিনিস, যেমন তরল হাইড্রোজেন। তরল হাইড্রোজেন হল সবচেয়ে ভাল সক্রিয় বস্তুগুলির অন্যতম। তরল হাইড্রোজেন থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসের প্রচণ্ড গতিবেগ হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন যাতে উবে না যায় তার জন্য তাকে বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত করে রাখতে হয় বৃহদায়তন ট্যাঙ্কের মধ্যে (তরল হাইড্রোজেনের ওজন হল জলের ওজনের ১৫ ভাগের এক ভাগ)। কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত আমাদের তরল হাইড্রোজেনের আণবিক রকেটটি অত্যন্ত জবরজং এবং অত্যন্ত ভারি হয়ে যাচ্ছিল। কাজেই তরল হাইড্রোজেনের বদলে আমরা জলই বেছে নিলাম। জল সুলভ, পৃথিবীতে তা সর্বদাই হাতের কাছেই আছে, এর ব্যবহার নিরাপদ, জ্বলে ওঠে না, ফেটে পড়ে না, ট্যাঙ্কগুলো ক্ষয় করে দেয় না। এই জন্য—প্রথম গ্রহান্তর যাত্রায় মানুষকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সম্মান জলকেই দেওয়া হল।

চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর 'সক্রিয় বস্তুর' প্রশ্নটা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এমন একটা বস্তু যা চাঁদ এবং পৃথিবী দুই জায়গাতেই আছে এবং চাঁদে ও পৃথিবীতে দুই জায়গাতেই যা ভরে নেওয়া

যায়। এই রকম বস্তু পেলে মহাকাশ ভ্রমণ খুবই সহজ হয়ে যাবে।

আণবিক জ্বালানি থেকে যে অভাবনীয় উচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া যায় সে তাপ নেওয়া সম্ভব হত যদি শুধু রিঅ্যাক্টরের দেয়ালগুলো সে তাপ সহ্য করতে পারত। ১ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে যে উত্তাপ পাওয়া যায় তা ১ কিলোগ্রাম পেট্রলের দেড় মিলিয়ন গুণ বেশি। এই জন্যই "চাঁদ—১"-এর সঙ্গে খুবই কম নিউক্লিয়ার অর্থাৎ আণবকেন্দ্রিক জ্বালানি থাকছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ৪০০ টন সক্রিয় বস্তু। এই ভারি বোঝাটা কমানো যায় না কি? হ্যাঁ, যায়, কিন্তু তার জন্যে দরকার বেরিয়ে আসা গ্যাসের গতিবেগ বৃদ্ধি করা। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসা গ্যাসের গতিবেগও বৃদ্ধি পায় ঠিকই কিন্তু আরও উচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব।

খুবই ভাল হত যদি একদম কোন সক্রিয় বস্তু ছাড়া কাজ চালানো যেত। তত্ত্বের দিক থেকে এটা সম্ভবও। এরকম এঞ্জিন বানানো সম্ভব যার ছিদ্রপথ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে থাকবে চূর্ণীকৃত নিউক্লিয়াস বা অণুকেন্দ্রের কণিকাগুলি। এইসব কণিকাগুলির ছিট্‌কে বেরিয়ে আসার গতিবেগ সেকেণ্ডে দশ সহস্র কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু হায়! সেই সঙ্গে উৎপন্ন হবে লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী তাপমাত্রা যা আমরা পারব না আয়ত্তে রাখতে। তাছাড়া

নিউক্লিয়ার বা আণবকেন্দ্রিক কণিকাগুলি ছুটে যাবে চতুর্দিকে ; আমরা জানিনা এগুলিকে কি করে ছিদ্রপথ দিয়ে চালিত করা যাবে। যদি কোনদিন বৈজ্ঞানিকরা এসব সমস্যার সমাধান করতে পারেন সেদিন আমরা এমন বিমানের সংবাদ পাব যার অভিযান হবে চাঁদে নয়, পাশের নক্ষত্রে, অন্য সব গ্রহ-মণ্ডলে।

হাল্কা কিন্তু টেকসই

সহনক্ষমতা পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানের ডক্টর

ফ, ব, মামেদোফ্

রোজই প্রধান নির্মাণবিদ এসে বলতেন "বিমানটাকে হাল্কা করুন।" আমরা তাঁর কথা মনে রেখেছিলুম। বিমানের ওজন যত কম হবে তত সহজে উৎপত্তি হবে প্রচণ্ড গতিবেগের আর তত সহজেই অতিক্রম করা যাবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে।

কিন্তু প্রচণ্ড গতিবেগ হলে বাতাসের প্রতিকূলতাও যাবে বেড়ে। গতিবেগ অর্জনের সময়েই প্রচণ্ড বাড়তি ভার এসে চেপে যাবে। তারপর আছে সুউচ্চ তাপমাত্রা! আছে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা! বিমানটিকে হাল্কা অথচ যথেষ্ট পরিমাণে টেকসই করা সহজ নয় মোটেই।

আমাদের নিজেদের দেশের শিল্প থেকেই আমাদের উৎকৃষ্ট মালপত্রগুলি পেয়েছি। পরবর্তী কয়েক বৎসরে ধাতুবিদ্যা টাইটানিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি হাল্কা ধাতুগুলির মত উচ্চ সহনক্ষমতাসম্পন্ন এক 'অ্যালয়' বা মিশ্র
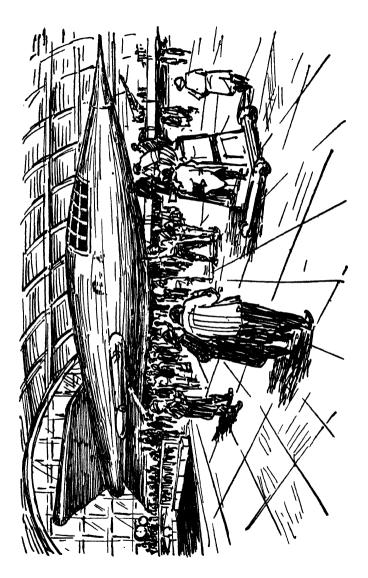
ধাতু সৃষ্টি করল যার গুণাবলী পরবর্তীদিনের শ্রেষ্ঠ ইস্পাতের থেকেও কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। এই মিশ্র ধাতুগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব লোহার তিন চার গুণ কম। এমন সব প্ল্যাস্টিক আমাদের আছে যা কাঁপুনি এবং আওয়াজ শুষে নিতে পারে।

আমাদের তাপসহনক্ষম বস্তুগুলি ২০ বছর আগের তুলনায় এখন দ্বিগুণ তাপ সহ্য করতে পারে। এঞ্জিনের রিঅ্যাক্টরের ভিতরটা বেরিলিয়াম অক্সাইডের তৈরি সছিদ্র সিরামিক দিয়ে লেপে দেওয়া। এই সিরামিকটা খুব উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। সক্রিয় বস্তু, যেমন ধরো জল, দেওয়ালের এই অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ওগুলিকে ঠাণ্ডাও রাখে। কিন্তু এই তাপ নিরোধক সিরামিক, এঞ্জিন থেকে উদ্ভূত প্রচণ্ড চাপ ঠেকিয়ে রাখার মত অবস্থায় থাকে না। সেইজন্য একে অপেক্ষাকৃত কম তাপ-সহনক্ষম কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশি সুদৃঢ় একটা 'অ্যালয়' বা মিশ্র ধাতুর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এই মিশ্র ধাতুটা (সাধারণত একে ধাতব-সিরামিক বলা হয়ে থাকে) তৈরি হয় অতি সূক্ষ্ম ধাতব কণিকাগুলি একত্র জমিয়ে ফেলে। এই জন্যেই এটাও সছিদ্র এবং সিরামিকের পলেস্তারার মতই ঠাণ্ডা হতে পারে।

জিনিসপত্র তো এইভাবে পাওয়া গেল। কিন্তু এই জিনিসপত্রের গুণগুলিকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগাতে হলে এমন কাঠামো বানানোর প্রয়োজন যাতে বাড়তি ওজন

থাকবে না এক রতিও। এর জন্য দরকার হল সবচেয়ে নিখুঁত হিসাব পদ্ধতির প্রয়োগ। এই হিসাব পদ্ধতিগুলি পরবর্তী দশকে সোবিয়েতের সহনক্ষমতা-সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

এখন অবশ্য হিসাবের কাজটাই করা হয়ে থাকে অন্যরকমে —আধুনিকতম দ্রুত কর্মক্ষমতা সম্পন্ন অঙ্ককষা যন্ত্রের সাহায্যে। এর দ্বারা বিভিন্ন রকমের অঙ্কের সমাধান হয়। এঞ্জিনীয়াররা এই যন্ত্রে সমস্যার সূত্রগুলি দিয়ে দেন আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লেদের স্বয়ংক্রিয় লিখনযন্ত্রে একটা উজ্জ্বল পর্দার উপরে উঠে আসে সমাধানটা।

এইবার সহন-ক্ষমতা বিশেষজ্ঞদের কাজ হয়ে দাঁড়ালো ফলাফলগুলি বের করে আনা এবং নির্মাণবিদদের কাছে তাঁদের সুপারিশ জানানো।

নক্শাটা পাশ হওয়ারও অনেক আগে সহন-ক্ষমতা-পরীক্ষাগারে পৃথক পৃথক অংশগুলির মডেলের এবং তার পরে একটা স্বচ্ছ পদার্থ থেকে তৈরি সমস্ত বিমানটারই পরীক্ষা শুরু করা হয়েছিল। এই পদার্থটা (এটা রূপোর সল্ট বা যৌগিক পদার্থগুলির অন্যতম) বিভিন্ন রকম ভার বস্তুর প্রভাবে বিভিন্ন রকম আলো ছাড়ে। আমরা একটা বিশেষ রকমের কাঠামোর উপরে মডেলটাতে ভার চাপালুম, তারপর সেটার 'এক্স-রে' পরীক্ষা করলুম আর তৎক্ষণাৎ পর্দার উপরে ফুটে উঠলো একটা বহুবর্ণ প্রতিচ্ছবি। রং এবং ছায়ার সাহায্যে সবচেয়ে বেশি জোর পড়া জায়গাগুলি আর সবচেয়ে বিপদ-

জনক অংশগুলি দেখা গেল। এইভাবে মডেলটির প্রত্যেকটি অংশে কতটা করে জোর পড়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হল।

এই সমস্ত পরীক্ষাগুলি থেকেই বিমানদেহের আকৃতি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হতে এবং প্রথম পরিবর্তনশীল স্বাভাবিক আয়তনের রকেট তৈরি করতে পারা গিয়েছিল। এই অতিকায় মডেলটি খুবই ভঙ্গুর একটা মিশ্র ধাতুর পাতলা আস্তরণ দিয়ে ঢাকা ছিল। পরীক্ষার সময় ভারবস্তুর নিচে বিমানটি ঠিকই ছিল, কিন্তু ভঙ্গুর ধাতব আস্তরণটি কম জোর পড়াতেই ফেটে গেল। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম বিপদজনক অংশগুলি কি কি এবং গ্রহণযোগ্য ভারবস্তুই বা কতটা হবে।

এঞ্জিনটা পরীক্ষা করা হয়েছিল পাহাড়ের গভীর গুহার মধ্যে যাতে তেজষ্ক্রিয় গ্যাসে কারুর ক্ষতি না হতে পারে। পরীক্ষাকারীরা কিন্তু নিজেরা গুহার মধ্যে ঢোকেননি, সমস্ত সংবাদই তাঁরা পাচ্ছিলেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি মারফত। নির্মাণ-বিদেরা গোটা বিমানটিকে তৈরি করলেন ভেতরে কোন দেয়াল বা পার্টিশান ছাড়াই। বিমানের দেহটার মধ্যেই সমস্ত প্রাথমিক ভারবস্তু। সেই জন্যই বিমানদেহের সমস্ত পরিসরটিকেই সুবিধামত ব্যবহার করে বৃহত্তম পরিমাণ জালানি মজুত করার আর দরকারী যন্ত্রপাতির জায়গা করে দেওয়া হল এবং বিমানকর্মীদেরও যত বেশি সম্ভব জায়গা করে দেওয়া হল।

আমাদের হাতের কাজ

বিমান কারখানার ফোরম্যান

গ, উ, ভালকফ

দিন কয়েকের মধ্যেই গ্রহান্তরগামী বিমানখানা চাঁদের দিকে রওনা দেবে। চাঁদে যেতে ইচ্ছুক এমন বহুলোকই পাওয়া যাবে আমাদের কারখানায়, কিন্তু চাঁদে এখনো টার্ণার মানে লোহাকাটা কারিগরের দরকার পড়েনি। কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ বিমান কারখানার কর্মীদের নিজেদেরও একটা গর্ব করার আছে; আমরা নিজেরা যদিও চাঁদে যাচ্ছি না কিন্তু আমাদের হাতের তৈরি জিনিসটাই তো উড়ে যাচ্ছে চাঁদে।

আমাদেরি বিমানে করে সোবিয়েত পাইলটরা ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উঠেছে আকাশে ; চাঁদে উড়ে যাওয়া চারটি স্বয়ংক্রিয় রকেটের সবকটিই জোড়া লাগানো হয়েছে আমাদের এখানে, এমনকি যে রকেটটি "চলচ্চিত্র গ্রাহকযন্ত্র সহ চন্দ্র পরিক্রমা" বলে সিনেমা ছবিটা তুলে এনেছিল সেইটি পর্যন্ত।

কিন্তু গ্রহান্তরগামী বিমান "চাঁদ—১" এর জন্য যে সব জিনিসপত্র করতে হয়েছে তা এত কঠিন ও জটিল যে এরকম আর কখনো করতে হয়নি।

বিমানের এঞ্জিনের মধ্যে প্রচণ্ড তাপ এবং চাপ সৃষ্টি হবে। এই জন্যে সবচেয়ে তাপ সহনক্ষম এবং সবচেয়ে সহনক্ষমতা সম্পন্ন বস্তুই নেওয়া হয়েছে। আমাদের সামনে আরেকটাও সমস্যা এসে পড়ল। যেমন ধরো, ওই প্রজ্বলন-প্রকোষ্ঠের জন্য ধাতব-সিরামিকের পাতলা টুকরোগুলো। প্রত্যেকটা টুকরোতেই ফুটো করতে হয়েছে। ড্রিলিং মেশিন—সাধারণ ফুটো করবার যন্ত্র দিয়ে এ কাজ করতে পারা যায়নি। খুব শক্ত তুরপুনও এই ধাতব-সিরামিক ফুটো করতে পারে না। সমস্যার সমাধান করল নতুন একটা আলট্রাসোনোরাস মেশিন, অর্থাৎ অতি-সূক্ষ্ম শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। এই যন্ত্রটিতে আছে ২৪ রকমের কলকব্জা—প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র, ঘনত্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্র ইত্যাদি। এই যন্ত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয় তার স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুটো করার যন্ত্রও কাজ করে। এটাকে তৈরি করা হয় ছিদ্রের মত করে। ফুটো করার যন্ত্রটা শব্দের স্পন্দনের সঙ্গে

সঙ্গে ছাড়তে থাকে এক রকমের খুব শক্ত ক্ষয়কারক চূর্ণ, যেমন এক্ষেত্রে কৃত্রিম হীরক কণিকা। এই কণিকাগুলির দ্বারা ধাতব-সিরামিকেরও ক্ষয় হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ফুটো হয়ে যায়।

তাপনিরোধক পলেস্তারা নিয়েও মুশ্‌কিল হয়েছিল। সাধারণত যে ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করা হয়ে থাকে, আমরা বছর ছয়েক যা নিয়ে কাজ করেছি, তা হচ্ছে থার্মোমিলিং মেশিন বা তাপমাত্রা দিয়ে কাটবার যন্ত্র।

থার্মোকাটিং বা তাপের সাহায্যে কাটার পদ্ধতিটা সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকদেরই আবিষ্কার। এর মূল সূত্রটি হল এই যে তাপমাত্রা বেশি হলেই পদার্থ নরম হয়ে যায়। আমাদের মেশিনে খুব বেশি তাপ পাওয়া যায় একটা ঘর্ষণের চাকার সাহায্যে। এই চাকাটা ঘুরতে ঘুরতে যন্ত্রের অংশ-গুলোকে উত্তপ্ত ও লাল করে ফেলে। তারপর চাকাটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কাটবার দাঁতগুলো, সেই দাঁতে চাঁছা টুকরোগুলো উঠে আসে আর কাটা হয়ে যায়।

এই তাপসহনক্ষম সিরামিকের জন্য আমাদের বিশেষ চাকা তৈরি করতে হয়েছে এবং কাটবার জন্য বিশেষ দাঁত তৈরি করতে হয়েছে ঐ সিরামিক থেকেই। থার্মোকাটিং বা তাপের সাহায্যে কাটবার সময় চাকাটা এবং অংশগুলো একই ধরনের জিনিস থেকে তৈরি হলেও চলে, তার ফলে ঘুরতে ঘুরতে চাকাটা সারাক্ষণই ঠাণ্ডা থাকে।

এখানে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে চাকাটার গতিবেগ

আর রকেটের গতিবেগের মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। চাকাটা যদি দণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে রেললাইন দিয়ে গড়াতে শুরু করে তো পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ পৌঁছে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মহাজাগতিক গতিবেগ সৃষ্টির জন্য ফ্যাক্টরীর মধ্যেই প্রায় মহাজাগতিক গতির দরকার হয়ে পড়ছে।

এখন আমাদের হাতের তৈরি জিনিসগুলি জোড়া লাগানো হয়ে গেছে, পরীক্ষা করা হয়েছে এবং চাঁদে যাত্রা করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চিন্তে উড়ে যেতে পারবেন। বিমানটি যাতে নিরাপদ হয় সেজন্যে আমরা সব কিছুই করে রেখেছি।

বিমানের যাত্রারম্ভ

সহকারী নির্মাণাধ্যক্ষ, এঞ্জিনিয়ার

উ, ন, তামারিন

জোড়া লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। মস্ত হ্যাঙ্গারটা নিস্তব্ধ, জনশূন্য। কাচের ছাদের উপর বরফ জমে উঠেছে; বৈদ্যুতিক আলোতে একটা অতিকায় ধাতব চুরুটের পালিশকরা ধারগুলো চক্‌চক্‌ করে উঠছে। এ হল আমাদের বিমান—"চাঁদ-১"। এর ছুঁচোলো নাকটা গিয়ে ঠেকেছে ফোল্ডিং দরজাটার গায়ে, যেন দরজা ভেদ করে চলে যাবে। দরজাটা আজ তালাবন্ধ। ২৫শে নভেম্বর সকালে এটাকে ঠেলে খুলে দেওয়া হবে আর গ্রহান্তরগামী বিমানটা ছুটে যাবে চাঁদের দিকে।

আমাদের বিমানটা কি-জাতের বিমান? বিমান-বিদ্যার ভাষায় একে বলা হয় পূর্ণ-ধাতব-মনোপ্লেন বা একটি-ডানা-বিশিষ্ট বিমান। এর চেহারার ধরনটা মনে রাখার মত। মাঝের অংশটির পরিধিই সবচেয়ে বড়—৬ মিটারের কাছাকাছি, দৈর্ঘ্য ৩২ মিটারের মত, এটা চারটে ট্রলিবাসের দৈর্ঘ্যের সমান। যদি রকেটটিকে খাড়া করে রাখা যায় তবে এর নাকটা দেখতে পাওয়া যাবে আটতলা বাড়িরও উঁচুতে। চাঁদে গিয়েও ঠিক অমনি করেই এটা দাঁড়িতে থাকবে, আর তখন দূরবীন দিয়ে এর ছায়াটা বিশেষ করে চেনা যাবে।

সমস্ত বিমানটাই আগাগোড়া ধাতুনির্মিত, এটা বানানো হয়েছে কতকগুলি নতুন উচ্চসহনক্ষমতাসম্পন্ন মিশ্র ধাতু দিয়ে এবং বিমান-দেহের বাইরেটা পালিশ করে খুব পাতলা একটা রূপোলি রংয়ের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। রংটা যে সৌন্দর্যের জন্যই দরকার তা মোটেই নয়—এই রং-এর আস্তরণ বিমানটিকে পৃথিবী-সমীপবর্তী মহাশূন্যের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা এবং অতিরিক্ত তাপ থেকে বাঁচাবে আর পালিশটা বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা দেবে কমিয়ে।

বাইরের দিক থেকে দেখলে "চাঁদ—১" এর সঙ্গে আধুনিক উচ্চগতিবেগ সম্পন্ন জেট বিমানগুলির খুবই সাদৃশ্য আছে। সামনে সেই ছুঁচোলো নাক, সেই পাতলা, তীরের মত ডানা, কেবিনে সেই একই আলো যা বিমানদেহের উপর দিয়ে দেখা যায় না, সম্পূর্ণ সমতল একই রকমের মসৃণ উপরিভাগ। এই সাদৃশ্য স্বাভাবিক। উড়োজাহাজ এবং "চাঁদ—১" দুটোকেই

বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে উড়ে যাওয়ার মত করে তৈরি করা হয়েছে। গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে কোন কিছুর বাধা নেই বললেই চলে, তাই সেখানে যেকোন আকৃতির বিমানই উড়তে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে অল্প কয়েক মিনিট উড়তে গেলেই বিমানের আকৃতিটার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই আকৃতির উপরই অনেকটা নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা কতটা হবে। ওড়া শুরু করার সময় এ বিষয়টাতে খুবই নজর দিতে হয়, বিশেষ করে চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময় বিমানটি যখন প্রচণ্ডগতিতে বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে দিয়ে পথ করে নেবে তখন তো বটেই। যে-সব অসমান, অদ্ভুত আকারের উল্কাপিণ্ড আকস্মিকভাবে ছুটে আসে সেগুলোর অবস্থা কি হয় তা মনে করে দেখো। বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে এই উল্কাপিণ্ড-গুলি জ্বলে ওঠে এবং ক্রমশ গলে যায়, আর শেষ পর্যন্ত ছোট হয়ে একেবারে উপে যায়; পৃথিবী পর্যন্ত আর পৌঁছতে পারে না।

আমাদের বিমানের সঙ্গে উড়োজাহাজের সাদৃশ্য আছে অনেক, কিন্তু সবদিক দিয়ে উড়োজাহাজের সঙ্গে এর মিল নেই। এই বিমানের মাপজোক অন্যরকমের, ডানা অন্য-রকমের, এর পশ্চাৎভাগও অন্যরকমের। এর ডানাটা অসাধারণ রকমের ছোট। এর দুটো কারণ আছে। উড়োজাহাজের ডানাটা এমন হওয়া চাই যার উপযুক্ত বহনক্ষমতা থাকবে —এমন বহনক্ষমতা চাই যাতে সমান্তরাল উড্ডয়নের সময়

উড়োজাহাজের পুরো ওজনটার ভারসাম্য বজায় থাকে। ডানাটা কাজে লাগবে প্রধানত অবতরণের সময়, যখন বিমানটা নেমে আসবে স্বচ্ছন্দ গতিতে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে অবতরণের সময় ডানাটার বহনক্ষমতা বিমানের ওজনের চেয়ে কম হওয়া চাই। এসব কিছু ছাড়াও, অবতরণের সময় বিমানটি প্রায় খালি হয়ে যাবে। জালানি তো থাকবেই না। "চাঁদ—১" এর ওজন উড্ডয়ন আরম্ভের সময় থেকে ৯ ভাগ কমে যাবে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে কেন ডানাটাকে ওরকম ছোট করা হয়েছে।

বিমানের দেহটা তো একটা মস্ত ফাঁপা চুরুটের মত। একটা লম্বালম্বি পার্টিশান দিয়ে সারি সারি কামরায় ভাগ করা হয়েছে। একেবারে নাকের দিকে হচ্ছে যাত্রীদের কেবিন, পেছনের দিকে আণবিক এঞ্জিন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এঞ্জিন এবং কেবিনের মধ্যবর্তী বাকি কামরাগুলি জলে পরিপূর্ণ থাকবে।

বিমানের দেওয়ালগুলি ট্যাঙ্কের দেয়ালেরও কাজ করবে। ডানাটাও ফাঁপা, লম্বালম্বি পার্টিশান করা। এখানে হাল ধরে রাখবার এঞ্জিনের জন্য জালানি রাখা হয়েছে। পার্টিশানের উপরে থাকবে অক্সিডাইজার আর তার নিচে থাকবে জালানি।

হাল ধরে রাখবার এঞ্জিনগুলো বসানো হয়েছে ডানার শেষ মাথায়, এদের প্রত্যেকটায় আছে দুটো করে ছিদ্রপথ যাতে সামনে ও পেছনে দুদিকেই গ্যাস যেতে পারে। গ্যাস পেছনের দিকে বেরিয়ে এলেই এঞ্জিনগুলি বিমানটাকে চালাতে

সাহায্য করে, তা না হলে বিমান থেমে যায়। এছাড়া এঞ্জিনগুলি বিমানটিকে নিচুও করতে পারে। এই কায়দায় এঞ্জিনগুলো বিমানের উড্ডয়নের দিক পরিবর্তনও করতে পারে, বিমানকে তার ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘোরাতেও পারে।

সাধারণ উড়োজাহাজের পশ্চাৎভাগ যে ধরনের সে-রকম না হয়ে আমাদের বিমানের পিছনদিকে থাকবে স্থিরতা-রক্ষক বড়ো বড়ো তিনটে পুচ্ছের ডানা, পরস্পরের সঙ্গে ১২০° কোণ করে বসানো। প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য চার মিটার করে। এগুলি দেওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে উড়বার সময় বিমানটি যাতে স্থিরভাবে থাকে তা নিশ্চিত করা। স্থিরতা-রক্ষক পুচ্ছের ডানাগুলিতে আছে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে উড়বার জন্য নিয়ন্ত্রণের হাল—সাধারণ উড়োজাহাজের যেমন থাকে। খাড়া করে বসানো স্থিরতা-রক্ষক ডানাটিতে আছে মোড় ঘোরানোর হাল, আর দুপাশের দুটোতে আছে গভীরতা অর্জনের হাল। এই হালগুলি শুধু ঘন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতর স্তরেই কাজ করবে, তার বাইরে আর এই হালগুলির কাজ হবে না। এই সময় আণবিক এঞ্জিন কাজ করতে থাকবে এবং বেরিয়ে আসা গ্যাসের প্রবাহের উপর বসানো তাপসহনক্ষম গ্যাসীয় হালের সাহায্যে উড্ডয়নের ব্যবস্থা করতে পারবে। বাদবাকি পথটায় শুধু ডানায়-বসানো হাল ধরে রাখবার এঞ্জিনগুলির সাহায্যেই বিমানকে ঘোরানো-ফেরানো যাবে।

সেই যে স্থিরতা-রক্ষক পুচ্ছের ডানাগুলি, তার মধ্যেই

লুকানো থাকবে কয়েকটা পায়ার মত কাঠামো। চাঁদে অবতরণের আগে এই পায়াগুলি সংকুচিত বাতাসের সাহায্যে বেরিয়ে পড়বে। প্রত্যেকটা পায়াই আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে আসবে এবং যেকোনো রকমের জায়গার উপরই বসানো যাবে। এই রকম পায়ার উপর ভর দিয়ে চাঁদে অবতরণ করা যথেষ্ট মুস্কিলের এবং কঠিন সমস্যার বিষয়। কল্পনা করে দেখো, যদি পায়াগুলো ঠিক না বসে তো কেমন হয়; . অথবা ধরো, যদি নিয়ন্ত্রণের সময় ধাক্কার চোটে বিমানটা পাশের দিকে পড়ে যায় তা হলে তো আরো খারাপ। এমন কি, অবতরণের সময় যদি বিমানে আঘাত লাগে তাহলেও আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়বে। আমরা চার জনেও বিমানটিকে তার পায়ের উপর খাড়া করতে পারব না। কিন্তু আমাদের হাতে এমন কয়েকটি কৌশল থাকবে যার সাহায্যে চাঁদে এই "তেপায়া" অবতরণটিকে একেবারে নিখুঁত করে ফেলা যাবে। পৃথিবীতে পরীক্ষার সময় বহুবার আমাদের এই কৌশল সফল হয়েছে।

বিমানের সামনের দিকটায় যাত্রী-কেবিনের জায়গা। তার মধ্যে যাওয়াটা খুব সহজ নয়; ঢুকতে হবে একটা স্লুইস (বন্ধ-করা) মঞ্চের মধ্যে দিয়ে। এতে মাত্র একটা লোককেই বসানো যায়। এই বন্ধ-করা মঞ্চটা থেকে সমস্ত বাতাস পাম্প করে বার করে ফেলা হয়। চাঁদে যাবার সময় বা মহাজাগতিক মহাশূন্যে ভ্রমণের সময় বহুমূল্য অক্সিজেন যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্যেই এটা করা দরকার।

মঞ্চটার মধ্যে যখন মানুষ ঢোকে তখন এর দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। বাতাসটা পাম্প করে বের করে না দিলে বাইরের দিকের দরজাটা খোলা যায় না। অবশ্য বিমানটি এখন পৃথিবীর উপরে আছে বলে এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাটা বন্ধ করা আছে। এখন বন্ধ-করা মঞ্চটির ভেতরের এবং বাইরের দুটো দরজাই একই সঙ্গে খোলা যাচ্ছে।

কেমন করে এই মঞ্চে গিয়ে পৌঁছোনো যাবে? বিমানটি যখন চাঁদে গিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন ২৫ মিটারেরও উঁচুতে এই মঞ্চটিকে দেখতে পাওয়া যাবে। প্লাষ্টিকে তৈরি একটা নমনীয় মই বেয়ে আমাদের নিচে নামতে হবে। পাছে কোন কারণে মইটা ছিঁড়ে যায় তাই বাড়তি আরেকটা মই তৈরি করা থাকবে। যদিও এরকম ঘটা প্রায় অসম্ভব তাহলেও আমরা ধরে নিচ্ছি যে চারজন লোকই বার হয়ে আসার পর মইটা ছিঁড়ে যাবে। এই রকম মুস্কিল হলে ঐ ভ্রমণকারীরা মহা বিপদে পড়বে—বিমানটার পায়ের কাছে হয়ত তারা মারাই পড়বে! এই রকম অবস্থা যাতে না ঘটে সেইজন্য বিমানের গায়ে বন্ধ-করা মঞ্চ থেকে একেবারে নিচের ছিদ্র পর্যন্ত লোহার আংটা দিয়ে একটা সরু গর্ত করে দেওয়া হয়েছে। উড়বার সময় এই গর্তটা জলে পরিপূর্ণ থাকবে, কিন্তু প্রথম বারেই জল ব্যবহৃত হয়ে যাবে। এই গর্তের লম্বা কাঠামোটা ৎসিম্‌লিয়ান্‌স্কি সাগরে অবতরণ করার সময় নৌকোর ভারসাম্য রাখার পাটাতনের মতো কাজ করবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে "চাঁদ—১" নির্মিত হওয়ার সময়

ছোট বড় নানা রকমের এই সব খুঁটিনাটি আমাদের বহুবার ভেবে দেখতে হয়েছে। আগে আমি নির্মাণবিদ হিসাবে এই সব নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, এখন বিমানের সহগামী এঞ্জিনীয়ার হিসাবে আমি আবার এগুলো পরীক্ষা করে দেখছি।

কাজটি আমার খুবই জটিল। দেখ না কেন—আমাদের বিমানে বসানো আছে তিনশোরও বেশি বৈদ্যুতিক মোটর এবং একশো কিলোওয়াট্ থেকে শুরু করে এক শতাংশ ওয়াট্ পর্যন্ত বিভিন্ন শক্তির আরো ছোট ছোট মোটর। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, কলকব্জা, হিসেবের যন্ত্র প্রভৃতি মিলে মোট যন্ত্রপাতি ২৭১৩টি হবে। যন্ত্রপাতিগুলির মধ্যে রয়েছে ২২০ হাজার ইলেকট্রনিক এবং কৃষ্ট্যাল ল্যাম্প, বিমানের সহগামী এঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমাকে এগুলির উপর নজর রাখতে হবে যাতে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নিখুঁত ভাবে কাজ করে। যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকঠাক করা হয়েছে পৃথিবীতেই। চাঁদে গিয়ে এবং পথের মধ্যে এগুলি কিরকম থাকবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

পৃথিবীতে ফিরে এসে ডিসেম্বর মাসে এ সম্বন্ধে আমি একটা বিশেষ বক্তৃতা দেব।

২৫শে নভেম্বর সকাল

(যাত্রার বিবরণ)

'লিতেরাতুর্নায়া গাজিয়েতা' সংবাদপত্র, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৭৪

সকাল ৭টা। যাত্রার আগেকার শেষ রাতটি চরম অস্বস্তির মধ্য দিয়ে কেটে ভোর হল। সারারাত ধরে গাঢ় নীল

আলোর আভার মধ্যে ব্যস্ত-সমস্ত মূর্তি গুলি ছোটাছুটি করেছে, হ্যাঙ্গারের জানালার মধ্যে জ্বলে উঠেছে নীল রংয়ের আগুনের শিখা। অবশেষে কাজকর্ম শেষ হয়েছে কিন্তু কেউই আর বাইরে যেতে চায়নি।

যাত্রারম্ভের বাকি আছে কয়েক ঘণ্টা। এ সময় আরেকবার সব কিছু পরীক্ষা করে দেখা দরকার নয় কি? আলট্রা সোনোরাস ডিফেক্টোস্কোপ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দ-সৃষ্টিকারী ত্রুটি ধরবার যন্ত্র আর কণ্ট্রোল ল্যাম্প নিয়ে আরেকবার রকেটের চারিদিকে ঘুরে দেখা যাক্; আরেকবার কেবিনের মধ্যে উঁকি দেওয়া যাক; আরেকবার আট্কানোর ব্যবস্থা-গুলি পরীক্ষা করা যাক; মহাজাগতিক পথের অভিযাত্রীদের জন্য তৈরি ইজিচেয়ারে একটু বসাও যাক।

রাত দুটোর সময় বাতাস উঠল, কাজবেকের চূড়োর উপর নড়ে উঠল বরফগুলো। স্টেশনের অধ্যক্ষ উত্তেজিত হয়ে হাওয়া অফিসের কেন্দ্রীয় ইন্স্টিটুটে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন, —কেন তারা এটা আগে লক্ষ্য করেনি, কেন ওটা তাদের চোখ এড়িয়ে গেছে, ইত্যাদি বলে! ঘন বরফ থাকার ফলে গতিবেগ যে বেশ কয়েক মিটার কমে যাবে। বরফের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাওয়ার সমস্যা আছে, আরো খারাপ ব্যাপার হলো যখন বিমানটা শব্দের দ্বিগুণ বেগে উড়ে যাবে তখন পেঁজাপেঁজা বরফের গুঁড়োগুলো খুবই বিপদজনক হয়ে উঠবে।

ইন্স্টিটুটের কর্মীরা ভরসা দিলেন—ঝড় হবে না, বাতাস পড়ে যাচ্ছে। এবং বাস্তবিকই সকালের দিকে বাতাস বন্ধ

হল, মেঘ সরে গেল, দেখা গেল তামাটে আকাশ আর তারই পশ্চাৎপটে ভেসে উঠল চোখ জুড়নো নীল চূড়োটা।

সারে আটটা। যারা বিদায় দেবে, তারা বেরিয়ে এসে দাঁড়াল "প্ল্যাটফর্মের" উপর। আমাদের সামনেই রয়েছে ছুঁচোলো নাক-ওয়ালা মস্ত রকেটটা, তার রূপালী ধারগুলিতে প্রতিফলিত হচ্ছে অসংখ্য বাতির আলো।

যারা বিদায় দিতে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন এঞ্জিনীয়ররা, যাঁরা কলকব্জা জোড়া লাগিয়েছেন সেই সমস্ত কারিগর জনসাধারণের প্রতিনিধিরা, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞরা। সবশেষে উপস্থিত হলেন অভিযানের প্রধান নায়কবৃন্দ—অধ্যাপক সিজফ্, বৈমানিক সোকোলফ, ডাক্তার আকোপিয়ান।

সবাই উদ্‌গ্রীব ওঁদের জড়িয়ে ধরবার জন্য, সবাই চাইছে করমর্দন করতে আর তাঁদের যাত্রা শুভ হোক এই কথা জানাতে। অভিযাত্রীরা বিদায় নিয়ে পোশাক বদলাবার কামরায় গিয়ে ঢুকলেন।

৯টা বেজে ২০ মিনিট। কয়েকটি অদ্ভুত চেহারার মূর্তি এসে দাঁড়াল। স্বচ্ছ মুখাবরণী সহ গোল শিরস্ত্রাণ এবং আঁটসাট

পোশাক পরে বিমানের কর্মীবৃন্দ এসে আমাদের মধ্যে হাজির হলেন। টুপি আর ওভারকোটের আচ্ছাদনের মধ্যে এঁরা এখন যেন অন্য জগতের প্রাণী, বলতে গেলে চাঁদের বাসিন্দাই।

মহাজাগতিক অভিযাত্রীরা ছোট্ট একটা সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে রকেটের নিচে গেলেন। তারপর একজনের পর একজন ডিম্বাকৃতি দরজাটার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঐ ত ওঁরা! এরি মধ্যে ভেতরে চলে গেছেন, বন্ধ-করা মঞ্চটা থেকে ঢুকলেন কেবিনের মধ্যে। স্বচ্ছ আলোর পেছনে ওঁদের ছায়াগুলো দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে গ্রহান্তর স্টেশনের ডিরেক্টর সাভেলিয়েফ্ মাইক্রোফোনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নির্দেশ দিলেন "যাত্রার জন্য তৈরি হও।"

আমরা হ্যাঙ্গারের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এলাম, ওখানে থাকা বিপদজনক।

যারা বিদায় দিতে এসেছিল তারা সবাই এখন ঢাকা জায়গায় চলে গেল—অবশ্য জানালার ধারে। আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে হ্যাঙ্গার আর পুরো উড্ডয়ন-সেতুটা।

হ্যাঙ্গারের দেওয়ালগুলো কুয়াশা ঢাকা, ভেতরে কি হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে ভালো দেখা যায় না। বিমানের আবছা কালো দেহটা ঘন হয়ে উঠেছে। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর অপেক্ষা করছি। বাকি আছে—৮…৭…৬ মিনিট… তিন মিনিট…দুই…আর মাত্র এক!

ঐ যে! আলো ঝলকে উঠল! হ্যাঙ্গারের ভেতরটা আলো হয়ে উঠল। যাত্রারম্ভ করানোর মঞ্চটার এঞ্জিনগুলির মধ্য থেকে বেরিয়ে এল লক্‌লকে আগুনের জিভ। রকেটটি এগিয়ে গেল। উড়োজাহাজের চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি, মুহূর্তের মধ্যেই রকেটের গতিবেগ বেড়ে উঠল, রকেটটি প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেল উড্ডয়ন-সেতুর উপর দিয়ে। আমরা এখন আর রকেটটাকে দেখতে পাচ্ছি না, দেখছি শুধু উড্ডয়ন-সেতুর উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা উজ্জ্বল বিন্দু। রেলের যারা "লাইন ক্লিয়ার" দেয়, তাদের বোর্ডের উপর চলন্ত রেলগাড়ীটা যেমন ছুটে যাওয়া বিন্দুর মত দেখায় এটাও তেমনি দেখতে হল। বিন্দুটা চড়াই বেয়ে উঠে গেল উপরে, অতিক্রম করে গেল বরফ ঢাকা মাঠ, পাহাড়ের শ্রেণী। আরো উঁচুতে উঠল, ঐ ত ওটা, হিমরাজের মাথার কাছে গিয়ে উঠেছে,

চূড়োর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। বরফের ঝল্‌মলানিতে এরি মধ্যে চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে ওটাকে দেখতে।

বিমানটা কোথায়? পাহাড়ের গায়ে, না পাহাড়ের উপরে? বরফ ঢাকা চূড়োরও অনেক উঁচুতে উজ্জ্বল বিন্দুটা ঝিলিক্ দিয়ে উঠছে। হ্যাঁ, ঐটাই সেই রকেট। ওটার পেছনে পেছনে লেগে আছে একটা সাদা ধোঁয়ার লেজ। কাজবেকের উপরে ছুঁচোলো চূড়োওয়ালা একটা নরম থামের মত গড়ে ওঠেছে,—খুব সরু আর খুব উঁচুতে। ঠিক তার উপরেই সেই ইস্পাতের সূঁচটা আকাশ ভেদ করে চলেছে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। সবেমাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড কেটেছে।

১টা বেজে ৫ মিনিট। সাদা ছোপটা বাতাসে মিশে যাচ্ছে, বেঁকে গিয়েছে সেটা। ঘন ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে ফিকে নীল রংয়ের আকাশে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল রকেটটা। যাত্রা ওদের শুভ হোক!

দ্বিতীয় খণ্ড

পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝপথে

[আরেকটি টেলিগ্রাম—

যোগাযোগ দপ্তর সোবিয়েত ইউনিয়ন ফটো-টেলিগ্রাম	সরকারী সংবাদ—
গ্রহান্তরবর্তী মহাশূন্য ২৫......১......২	যাত্রারম্ভ চমৎকার হয়েছে। ১০টা—০০ মিনিটে "চাঁদ—১" প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করেছে এবং এঞ্জিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা যাত্রারম্ভ করার জায়গা থেকে ১১,০০০ কিলোমিটার দূরে আছি। যাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা সুস্থ।
ঠিকানা...মস্কো... সোবিয়েত মন্ত্রীদপ্তর সোবিয়েত ইউনিয়ন	"চাঁদ—১" বিমানের ক্যাপ্টেন : এম্. সিজফ্

পৃথিবী থেকে চাঁদে যাত্রা এবং প্রত্যাবর্তন

"চাঁদ—১" বিমানের পাইলট **আ, ভ, সোকোলফ্**

যাত্রারম্ভের বহু আগে থেকেই আমরা বিমান চালানো শেখা শুরু করেছিলাম। সমস্ত যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে, বায়ুমণ্ডলে, বস্তুশূন্যতায়, বাড়তিভারের সময় এবং সম্পূর্ণ ওজনহীনতার সময় পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের জন্য রাস্তার হিসাব তৈরি করে দিয়েছেন, তৈরি করে দিয়েছেন আকাশের বিশেষ ম্যাপ, বিস্তারিত চার্ট এবং টাইমটেবল। এখন উড্ডয়নের টাইমটেবলের দিকে তাকালেই আমি আপনাদের প্রত্যেকটি সেকেণ্ডের খবর দিতে পারি,—আমরা কোন জায়গায় রয়েছি, এই মুহূর্তে আমাদের গতিবেগ কত, কোনদিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, কোন্ তারার সঙ্গে তুলনা করে আমরা আমাদের স্থান নির্দেশ করছি, সব খবর দিতে পারি। সৌভাগ্যবশত, গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে আবহাওয়া সর্বদাই পরিষ্কার, সর্বদাই পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য এবং তারাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের পথ হারানোর কোন ভয় নেই। দেখছেন তো—গ্রহান্তরগামী বৈমানিকের কত সুবিধা।

আমাদের মূল সমস্যা জ্বালানির মিতব্যয়িতা নিয়ে। যাতে অল্প জ্বালানি খরচ হয় তার জন্যই প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই আমরা কাটাব এঞ্জিন বন্ধ করে। চাঁদে যাওয়ার এবং সেখান থেকে ফেরার ১০০ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এঞ্জিনটা কাজ করবে মাত্র ১৫ মিনিট। বাদবাকি সময়টা বিমানটি চলবে হয় যাত্রা

শুরু করার সময়কার গতিবেগের ফলে, নয়তো পৃথিবী এবং চাঁদের আকর্ষণের ফলে। উড্ডয়ন আরম্ভের পর থেকেই বিমানের যে যাত্রাপথ শুরু হল সেই ট্র্যাজেক্টরীর অর্থাৎ মহাশূন্যের বক্রতল ভ্রমণপথের প্রথম অংশটুকুকে 'সক্রিয় অংশ' বলে। সক্রিয় বলা হয় এই জন্যই যে শুধু এই অংশটাতেই বিমানটিকে চালানোর জন্য এঞ্জিনটা কাজ করতে থাকে। এখানে বাধা আমাদের দুটি—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা। যাতে বায়ুমণ্ডলের বাধাকে অতিক্রম করতে জ্বালানির খরচ বেশি না হয় সেইজন্য বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সবচেয়ে সোজাপথে, সিধে উপরের দিকে উড়ে যেতে হবে। কিন্তু তাতে আবার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রচণ্ড শক্তিতে বাধা দেবে, বিমানের গতি দেবে কমিয়ে, আর তাতে এঞ্জিনটার কাজের সময়ও যাবে বেড়ে। বিমানের গতিবেগ অর্জনে মাধ্যাকর্ষণ যাতে বাধা না জন্মাতে পারে সেইজন্য খাড়া উপরের দিকে উঠে না গিয়ে যেতে হবে সমান্তরালভাবে ভূমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে। মাধ্যাকর্ষণের বাধাকে অতিক্রম করার পর আমাদের একটি মাঝামাঝি রাস্তা নিতে হয়েছে। "চাঁদ—১" হঠাৎ উঠে গেছে ওপরের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে সমান্তরাল পথ ছেড়ে এক জটিল বক্রতল পথে পরিক্রমা করেছে। ১০০ কিলোমিটারের উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের বাধা খুব একটা বেশি নয়; সেখান দিয়ে বিমানটা পশ্চিম থেকে পূবে প্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠের সমান্তরাল পথে গিয়েছে, কেননা তাতে পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে কাজে

লাগানো যায়। প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করার পর আমরা এঞ্জিন দিয়েছি বন্ধ করে।

কতটা গতিবেগ আমাদের দরকার তার আলোচনা করে তারপর আমরা পরবর্তী বিষয়ে যাব। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিবেগ হল সেকেণ্ডে ১১.২ কিলোমিটারের সমান। বায়ুমণ্ডলের বাধাটা যদি হিসাবে ধরা না হয় তা হলে এই রকম গতিবেগের সাহায্যে বস্তুদেহ ভূমণ্ডল ত্যাগ করে যেতে পারে এবং অনন্তকাল ধরে তা শূন্যে ঘুরতে পারে। কিন্তু আমাদের অনন্ত উড্ডয়নের তো দরকার নেই, আমরা শুধু চাঁদে পৌঁছাতে চাই। এজন্যে সেকেণ্ডে ১১.১ কিলোমিটারের গতিবেগই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট (গতিবেগের দিক দিয়ে আমরা খানিকটা মিতব্যয়ী হতে পারলাম বটে, তবে যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা হয়নি)। কিন্তু যেহেতু পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর এঞ্জিন বন্ধ না করে কয়েকশত কিলোমিটার উপরে আমরা এঞ্জিন বন্ধ করব, সেইহেতু এই গতিবেগের পরিমাণটা আরো কমানো যায়; কারণ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত বেশি দূর হবে ততই মাধ্যাকর্ষণের শক্তি হ্রাস পাবে, আর সেই অনুপাতে এই গতিবেগও কমাতে পারা যায়। আমাদের বিমান যাত্রার জন্য ন্যূনতম যে গতিবেগ প্রয়োজন তা হচ্ছে সেকেণ্ডে ১০.৭ কিলোমিটার।

এই ন্যূনতম গতিবেগ সহ পৃথিবী ত্যাগ করে চাঁদ পর্যন্ত যেতে আমাদের ১১৫ ঘণ্টা, মানে প্রায় পাঁচদিন লেগে যেত। কিন্তু এই গতিবেগকে সামান্য কিছু পরিমাণ অর্থাৎ আনুমানিক

শতকরা ১% ভাগ বাড়ানোর দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। গতিবেগের এই সামান্য বৃদ্ধিই উড্ডয়নকালকে কমিয়ে ৫০ ঘণ্টা করে দিয়েছে। আমরা চাঁদে গিয়ে পৌঁছুব ২৭শে নভেম্বর, মস্কোর সময় অনুযায়ী বেলা ১২টায়।

গতিবেগের এই সামান্য বৃদ্ধির ফলেই উড্ডয়নকালের হঠাৎ এত পরিবর্তন হল কেন? এটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:—যে গতিবেগে বিমানটিকে আমরা চালনা করেছি তাতে বিমানটি এক প্রচণ্ড শক্তি পেয়েছে। কিন্তু এই শক্তির প্রায় সমস্তটাই প্রথম ঘণ্টাতেই ব্যয় হয়ে যায় মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সংগ্রাম করতে। পৃথিবীর কাছাকাছি থাকার সময় বিমানটির গতিবেগ থাকে প্রচণ্ড, কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রতিকূল শক্তিও তখন প্রচণ্ড। এর ফলে বিমানের গতিবেগ তাড়াতাড়ি হ্রাস পেয়ে যায় এবং বেশির ভাগ পথটাই বিমানটি ক্রমশই বেশি বেশি আস্তে চলতে থাকে। একশো পনেরো ঘণ্টা শূন্যযাত্রায় গড়পড়তা গতিবেগ থাকবে সেকেণ্ডে এক কিলোমিটারের কাছাকাছি আর নিম্নতম গতিবেগ থাকবে সেকেণ্ডে ৩০০ মিটার। তার মানে, রাস্তার কতকটা অংশে বিমানটির গতিবেগ হবে কুড়ি বছর আগেকার জেট বিমানের চেয়েও কম। একজন সাঁতারু যখন খরস্রোতা নদী পার হতে গিয়ে স্রোতের সঙ্গে লড়াইয়েই সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ফেলে ও ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ের উপর ওঠে তখন তার যেমন অবস্থা হয় তারই সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে আমাদের বিমানটির। এ থেকেই

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীর আকর্ষণকে জয় করার জন্য বিমানটির একটা বাড়তি শক্তি না হলে চলে না। বিমানের মূল শক্তির তুলনায় এ শক্তিটা যতই কম হোক না কেন, এই বাড়তি শক্তি দ্বারাই আকস্মিকভাবে বিমানটির গড়পড়তা গতিবেগ বেড়ে যাবে। এছাড়াও এ সময়ে বিমানের পথও কমে আসবে।

এইভাবে আমরা প্রাথমিক গতিবেগ অর্জন করলাম এবং এঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। তা হলে এখন বিমানটা উড়ে চলেছে কেমন করে? যদি আমাদের ওপর কোন রকম শক্তিই ক্রিয়া না করত তবে ইনার্শিয়া বা বস্তুর স্থিতিধর্মের প্রভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ রয়েছে এবং তার ফলে আমাদের পথটা যাচ্ছে বেঁকে। পৃথিবীর আকর্ষণ আমাদের পথকে একটি প্যারাবোলা বা পরাবৃত্তে পরিণত করে দিয়েছে, যে পরাবৃত্তটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এই পথে যাওয়ার ফলেই ককেশাসের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর থেকেই আমরা চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পথের খানিকটা মাত্র অতিক্রম করেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লক্ষ্যটিকে।

আমাদের ৫০ ঘণ্টা ভ্রমণকালের মধ্যে চাঁদটি যতক্ষণ পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করবে তাতে চাঁদকে অনেক রাস্তা পার হতে হবে—১৮০,০০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। পৃথিবীর পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে চাঁদটা মীনরাশি থেকে মেষরাশির দিকে সরে যাচ্ছে। এই জন্যেই চাঁদের দিকে না

গিয়ে মেষরাশির দিকেই আমাদের যেতে হচ্ছে। মোট পথের নয়-দশমাংশ চলে যাওয়ার পর আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছুব যেখানে চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। এর মধ্যে কিন্তু গতিবেগ প্রায় সবটাই কমে গিয়েছে ; এখন গতিবেগ আবার বাড়তে শুরু করবে। ৪০,০০০ কিলোমিটারের মত উচ্চতা থেকে সেকেণ্ডে ৩৯ কিলোমিটারের মত গতিতে আমাদের বিমানটি যদি চাঁদের উপর পড়ে তা হলে তো সেটা চূরমার হয়ে যাবে। কারণ এই রকম পতন ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন বায়ুমণ্ডল তো চাঁদে নেই। এই রকম বেগে পড়লে তাকে নিশ্চয়ই অবতরণ বলা চলে না ! এই বেগ বন্দুকের গুলির বেগের চেয়েও বেশি। এই রকম বেগে পতন হলে তার ফলে একটা বিপর্যয় হত নিশ্চয়ই। সুতরাং পতনটা থামিয়ে দেওয়া দরকার। চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে আমরা হাল ধরে রাখার এঞ্জিনগুলোর সাহায্যে পিছন দিকটাকে আগে করে দিয়ে বিমানটাকে ঘুরিয়ে দেব। তারপর মূল এঞ্জিনটাকে চালু করে দেব। এতে গতিটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। চাঁদে অবতরণটা কিন্তু খুব আরামের হওয়া চাই।

ফিরতি পথ সম্বন্ধে কি বলব ? চাঁদে আমাদের ব্যবহারের জন্য কোন উড্ডয়ন সেতু তৈরি নেই। বিমানের পাখার উপর ভর করেই যাত্রা করতে হবে। কিন্তু চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণের থেকে ৬ ভাগ কম হওয়ায় চাঁদ ছেড়ে আসা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার চেয়েও অনেক সহজ। সেকেণ্ডে ১.৫ কিলো-

মিটার গতিবেগ অর্জন করে ৫০ কিলোমিটারের উঁচুতে ওঠার পর আমরা এঞ্জিন বন্ধ করে দেব। এই গতিতে চলবার সময় আমরা হয়ে যাব যেন চাঁদের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। এই এঞ্জিন বন্ধ করা অবস্থায় এই উচ্চতায় আমাদের বিমানটি চাঁদের চতুর্দিকে একবার পরিক্রমা করবে এবং তখন আমরা চাঁদের উল্টো পিঠটা পর্যবেক্ষণ করব; এই সময় এর বেশির ভাগটাই সূর্যালোকিত থাকবে। একটি স্বয়ংক্রিয় রকেট চাঁদের এই "পেছন দিকটার" ফটো তুলে এনেছিল, অবশ্য আরো অনেক দূর থেকে। কিন্তু তা হলেও "নিষিদ্ধ" দিকটি থেকে চাঁদকে দেখার যে সুযোগ আমরা পাব তার সদ্ব্যবহার না করে কি থাকা যায়?

যখন চাঁদের চতুর্দিকে পরিক্রমা শেষ হবে তখন আবার অল্প সময়ের জন্য এঞ্জিনটিকে চালিয়ে দেওয়া হবে এবং বিমানটি ছুটে চলবে পৃথিবীর দিকে। ফিরতি পথে যাত্রার সময় লাগবে একই রকম। বিমানটি চাঁদের দিক থেকে সরে আসতে আসতে যেই এমন দূরত্বে এসে পৌঁছবে যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদের আকর্ষণের চেয়ে বেশি, অমনি সেটা পৃথিবীর দিকে পড়তে শুরু করবে। আর এই সময় থেকে এর গতিবেগ একটানা বেড়েই চলতে থাকবে।

পৃথিবীতে অবতরণ করা হলো আমাদের যাত্রার সব চেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে বিপদজনক পর্যায়গুলির মধ্যে একটি। ১,০০০ কিলোমিটারের উচ্চতায় এলে আমরা বিমানটিকে ঘুরিয়ে তার পেছনের দিকটা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে দেব এবং

যাতে পতনটা রুদ্ধ হয় এবং গতিবেগ সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটার থেকে ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত কমে যায় সেইজন্য এঞ্জিনটাকে চালু করে দেব। তারপর নাকটা পৃথিবীর দিকে করে বিমানটি আবার ঘুরে যাবে এবং বাকি গতিবেগটা বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতার ফলে কমে যাবে। তাছাড়া গতিবেগ কমাবার জন্য আমাদের একবার পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে হবে।

অর্থাৎ সমস্ত ভূমণ্ডলটিই হয়ে যাবে আমাদের "এরোড্রাম", যেন সেই "এরোড্রামে" অবতরণের আগে আমরা চক্কর মারছি।

কিন্তু আমাদের "এরোড্রামটি" যে নিজের মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরছে সেটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে, অর্থাৎ মনে রাখতে হবে যে যদি আমরা পশ্চিম থেকে ৎসিম্‌লিয়ান্‌স্কি সাগরের দিকে উড়ে যাই তবে আমাদের গতিবেগ কমে যাবে এবং গতিবেগ একেবারে বন্ধ করাও অনেক সহজ হয়ে আসবে। শিক্ষা নেবার সময় আমি কয়েকবার উচ্চ-গতিবেগ সম্পন্ন বায়ুমণ্ডলগামী রকেটকে ৎসিম্‌লিয়ান্‌স্কি সাগরে অবতরণ করিয়েছি। আশা করছি এবারেও বিফল হব না।

বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে

ফিজিক্‌স্ অর্থাৎ ভূ-পদার্থবিদ্যা ইনষ্টিটুটের প্রধান বিজ্ঞানকর্মী

আ, ম, ভ্লাদিমিরফ্

"চাঁদ—১" বিমানটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর সুদূরবর্তী লক্ষ্যের দিকে শুরু করল যাত্রা। চার লক্ষ

কিলোমিটার দীর্ঘ পথে বিমানটিকে বহু বাধা বিপত্তিই অতিক্রম করতে হবে। এই সব প্রাথমিক বাধা বিপত্তিগুলির মধ্যে একটি হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল।

আমাদের জীবনে এই বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বায়ুমণ্ডল ছাড়া পৃথিবী হয়ে যেত প্রাণশূন্য, নিঃশব্দ, প্রায় একরঙা এবং মৃত। আমাদের অভিযাত্রীদের কাছে চাঁদটা মনে হবে ঠিক এমনি।

কিন্তু গ্রহান্তরগামী বিমানের যাত্রীদের পক্ষে এই বায়ুমণ্ডল অন্য রকম হয়ে দাঁড়াবে। তাদের পক্ষে এই বায়ুমণ্ডল হবে বিপদজনক, ষড়যন্ত্রকারী এক শত্রুর মতো। এই জন্যই অ্যাষ্ট্রোনটিকস বা গ্রহান্তরগমন বিদ্যায় বায়ুমণ্ডলের শত সহস্র কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত সবকটি স্তরের বৈশিষ্ট্য জানবার জন্য বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অ্যাস্ট্রোনটিকস্‌কে বিবেচনা করতেই হবে, সম্ভবত তা হল এই যে, সমস্ত গতিশীল বস্তুকেই বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা সহ্য করতে হচ্ছে। তার মানে, গ্রহান্তরগামী বিমানকেও এই প্রতিকূলতা সহ্য করতে হবে। এতে ভাল হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে ?

এটা ভাল, আবার খারাপও। খারাপ হলো যখন বিমানটি পৃথিবী ছেড়ে ওড়া আরম্ভ করবে তখন। বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করবার জন্য মূল্যবান জালানি খরচ করে বিমানটিকে শক্তিক্ষয় করতে হবে।

বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা অতিক্রমণের জন্য জালানির

বাড়তি ব্যয় কতটা হবে তা কি হিসেব করে ফেলা সম্ভব? দুর্ভাগ্যবশত শুধু আনুমানিক ভাবেই হিসেব করা যায়। বায়ুমণ্ডলের নিম্নতর স্তরে ঘন বাতাসের মধ্যে বেশ ভালো ভাবেই উড্ডয়নের ব্যাপারটা পর্যালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু বহু উচ্চে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। বাতাস সেখানে অসম্ভব রকমের পাতলা। কম উচ্চতায় উড্ডয়নের অবস্থা নিয়ে ভালভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই উচ্চতর স্তরে কিন্তু প্রয়োজনীয় অবস্থাটা মূলগত ভাবে পৃথক। এইজন্যই উড্ডয়নকারী গ্রহান্তরগামী বিমান বায়ুমণ্ডলের কাছ থেকে

যে বাধাটা পাবে এখনই তার সঠিক হিসাব করা যাচ্ছে না। স্বয়ংক্রিয় রকেটের তথ্যাদির ভিত্তিতে যে আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে তা থেকে দেখা গেছে যে বায়ুমণ্ডলের এই বাধার জন্য যে পরিমাণ বাড়তি জালানি ব্যয় হয় তা বিমানটির চূড়ান্ত গতিবেগকে সেকেণ্ডে প্রায় এক কিলোমিটার করে বাড়িয়ে দিতে পারত।

কিন্তু বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা সব সময়ই যে গ্রহান্তরগামী বিমানের পক্ষে ক্ষতিকারক তা নয়। কখনো কখনো এই প্রতিকূলতা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে পারে। এ রকমটা ঘটতে পারে বিমানটির পৃথিবীতে ফিরে এসে অবতরণের সময়ে অথবা অন্য কোন গ্রহে যেখানে বায়ুমণ্ডল আছে, সেখানে অবতরণের সময়ে। যদি বিমানটির গতি এঞ্জিনের সাহায্যে রুদ্ধ করতে হত তবে মূল্যবান জালানি খরচ করতে হত। যদি বিমানের গতিবেগ রুদ্ধ করার জন্য বায়ুমণ্ডলের প্রতি-কূলতাকে কাজে লাগানো হয় তবে বাড়তি জালানির খরচটা একেবারে এড়ানো যেতে পারে অথবা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। অবশ্য বায়ুমণ্ডলের বাধাকে কাজে লাগিয়ে এইভাবে অবতরণ করার মধ্যে যথেষ্ট অসুবিধা ও বিপদ আছে। এই বাধাবিপত্তির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বায়ুমণ্ডলে ওড়ার সময় বিমানের তাপ।

কিসের জন্য এই তাপ হয়? শুধুই বায়ুমণ্ডলের প্রতি-কূলতার জন্য? হ্যাঁ, কারণ গ্রহান্তরগামী বিমানকে বায়ু-মণ্ডলের এমন কতকগুলি স্তর ভেদ করে যেতে হয় যেখানে

তাপমাত্রা শত ডিগ্রী এমন-কি সহস্র ডিগ্রী ছাড়িয়ে যায়।

এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরটি হচ্ছে দশ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে ওজোন গ্যাস আছে। ওজোন অক্সিজেনেরই মত দুইটি পরমাণু দিয়ে তৈরি নয়, তিনটি পরমাণু দিয়ে তৈরি, এটা সবাই জানে। যাই হোক ওজোন এবং অক্সিজেনের প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য প্রচুর; বিশেষত ওজোন সূর্যরশ্মির একটা অংশকে আটক রাখে; কিন্তু অক্সিজেন সেটাকে অবাধে ছেড়ে দেয়। এই ভাবে ওজোনের স্তরটি পৃথিবী পৃষ্ঠের জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক একটি রক্ষাকারী আবরণ হিসাবে কাজ করে। এই রশ্মি-গুলিকে শোষণ করে নিয়ে ওজোন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার ফলে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ শূন্যের অনেক উপরে উঠে যায়, যদিও এর একটু উপরেই ৬০° ডিগ্রা ঠাণ্ডার রাজত্ব।

আরো উচ্চতায় বায়ুমণ্ডল হল বিদ্যুৎসম্পৃক্ত। এই বিদ্যুতের উদ্ভবের কারণ হল এই: অত্যন্ত শক্তিশালী সূর্য-রশ্মির অণু এবং পরমাণুগুলির উপর বায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ার ফলে এগুলি চার্জড্ বা বিদ্যুতায়িত কণিকাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। একে বলা হয় আয়ন। এই জন্যই আনুমানিক ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে শুরু করে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতম স্তরগুলিকে আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল বলা হয়। বায়ু-মণ্ডলের এই উর্ধ্বতম স্তরটিকে একটি প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক রাসায়নিক কারখানার মত মনে হতে পারে। এর মধ্যে নতুন পদার্থের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে জটিল সব প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে

চলেছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার ফলে বাতাসের তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে শত সহস্র ডিগ্রীতে উঠে যায়।

যাইহোক, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম স্তরে বিমানটি কিন্তু এই উচ্চ তাপমাত্রা অনুভব পর্যন্ত করবে না। কারণ আমরা যাকে উষ্ণতা বা তাপ বলি তা হল অণুগুলির বিশৃঙ্খল চাঞ্চল্যমাত্র আর তাপমাত্রাটা হল এই অণুগুলিরই গড়পড়তা গতিবেগ।

আয়নমণ্ডলের মধ্যে বাতাস খুবই পাতলা এবং সেখানে অণুপরমাণু খুবই কম। যদিও এই পৃথক কণিকাগুলি প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে তবু কিন্তু বিমানের আবরণটিকে বিশেষ কোন উত্তাপ দিতে পারে না।

কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে সব উল্কাপিণ্ড "জ্বলতে জ্বলতে" উবে যায় সেগুলির অবস্থা কি হয় তা মনে করে দেখ। বিমানটি যদি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড মহাজাগতিক গতিতে ছুটে যায় তাহলে এও উল্কাপিণ্ডগুলির মতই বাতাসের কণিকাগুলিকে ঠেলে ঠেলে পথ করে নেবে। বিমানের সঙ্গে কণিকাগুলির ধাক্কা লাগলে এদের গতিশক্তিটা তাপে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বিমানের আবরণটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আঘাতকারী কণিকাগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে তবেই উত্তাপটা প্রচণ্ড হয়ে উঠবে। অর্থাৎ শুধু স্বল্প উচ্চতার ঘন বাতাসের মধ্যে উড্ডয়নের সময়ই এই রকম তাপ হতে পারে। এই জন্যই বহুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন বিমানগুলি পৃথিবীর খুব উপরে উঠে যায়। উত্তাপের জন্য নিচু দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে উড়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

গ্রহান্তরগামী বিমানের এই রকম উত্তাপে পড়বার আশঙ্কা কখন হয়? স্বভাবতই ওড়া আরম্ভ করার সময়ে এ রকম বিপদ হয় না, কারণ সে সময়ে অপেক্ষাকৃত কম গতিতে এটা ঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলবে। অবতরণের সময়ও এই রকম হবে। বিমানটি যখন মহাজাগতিক গতিতে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরের মধ্যে ছুটে এসে পড়ে তখনই তার অবস্থা হয় উল্কা-পিণ্ডের অবস্থার মত এবং বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের ব্যবস্থা না থাকলে উল্কাপিণ্ডের মতই বিমানটির জ্বলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাহলেও, বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতাকে বিমানের গতিরোধ করার কাজে লাগানোর যে কথাটা আগে বলা হয়েছে সেটাও করা সম্ভব। কিন্তু এটা খুবই সাবধানে এবং নিপুণভাবে করা দরকার।

আমাদের এই গ্রহান্তরগামী বিমানের আগে যে সব স্বয়ংক্রিয় বহু-স্তরের রকেট শূন্যযাত্রা করেছে সেগুলোর জন্য বায়ুমণ্ডল ছিল আরো বেশি দরকারী। এই রকেটগুলির প্রথম স্তরে ছিল 'গ্যাস-টারবাইন'—বাতাসই যার "সক্রিয় বস্তু"। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল থেকেই এই এঞ্জিন কিছু পরিমাণ সক্রিয়বস্তু পেয়েছিল। যার ফলে রকেটের উড়বার সময়কার ওজন কমানো গিয়েছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে এখন আমরা ভালোভাবেই জানি। তাই এই সুদূর পথে চাঁদ-এর যাত্রা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে।

তিনগুণ ওজন থেকে ওজনশূন্যতার দিকে

জীববিষ্মার স্নাতকোত্তর গবেষক

স, ই, লিসিৎসিনা

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল দশ কোটি বছর আগে। তারপর থেকে জীবিত প্রাণীরা ক্রমশই পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। কিন্তু মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী কেউই গ্রহান্তর্বর্তী অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। গ্রহান্তর্বর্তী অবস্থাগুলি কি তা ঠিক মত অনুধাবন করা, গ্রহান্তর যাত্রায় মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য করে দেওয়া, তাকে বিপদ থেকে বাঁচানো—এই সবই হল আমাদের ল্যাবরেটরীর গবেষণার উদ্দেশ্য। বহু সমস্যারই সমাধান আমাদের করতে হয়েছে, কিন্তু এখানে শুধু একটা সমস্যার কথাই বলব,—তা হল ওজনের সমস্যা।

পৃথিবীতে কোন কিছুর ওজন একই রকম থাকে, পরিবর্তিত হয় না। বাকুতে যদি একটা পিপেতে ২০ টন কেরোসিন তেল ভর্তি কর তবে মস্কোতেও সেই কুড়ি টনই পেয়ে যাবে। লভফ-এ যে বাটখারার ওজন ১ কিলোগ্রাম, ব্লাদিভস্তকেও সেটা একই থাকবে। পৃথিবীর সীমানার বাইরে কিন্তু ওজন খুবই অনিশ্চিত হয়েযায় এবং এক রকম থাকে না।

কেন এরকম হয় ? সবার আগে ওজনটা কি তাই দেখা যাক।

ব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গাতেই আকর্ষণের শক্তি কাজ করে। সূর্য আকর্ষণ করে পৃথিবীকে, পৃথিবী আবার আকর্ষণ করে

চাঁদকে। পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত বস্তুই—সাগর, পাহাড়, ঘর-বাড়ি, রেলগাড়ি, আমরা, তোমরা, সবাই আকর্ষিত হচ্ছি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ছি না তার কারণ আমাদের পায়ের নিচের কঠিন মাটির বাধা। মেঝে, মাটি, চেয়ার ইত্যাদি যার উপরেই আমরা থাকি না কেন মাধ্যাকর্ষণ তারই সঙ্গে আমাদের ধরে আটকে রাখে। এই আটকে ধরে রাখার শক্তিটাই হল ওজন।

শুধু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলেই যে ওজনের সৃষ্টি হয় তাই নয়, অন্যান্য শক্তির জন্যও ওজন সৃষ্টি হয়। যখন রেলগাড়ি চলতে থাকে আর গতিবেগ অর্জন করতে থাকে, তখন বসে থাকার 'ইনারশিয়া' বা জাড্যের শক্তি আকর্ষণ করে আমাদের পিঠকে। হঠাৎ বাঁকের মুখে আমরা একটা উৎকেন্দ্রিক শক্তি অনুভব করি। এইসব শক্তিগুলি যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের থেকেও কয়েক গুণ বেশি হয়ে যায় তাহলে একটা মানুষের ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হয়ে যাবে।

বৈমানিকদের কাজ করতে হয় বাড়তি ভার নিয়ে। ধরো উড়োজাহাজ যখন প্রচণ্ডগতিতে ছোঁ মেরে ছুটে এসে পৃথিবীর উপর চক্কর মারতে শুরু করে, উৎকেন্দ্রিক শক্তি তখন তিনগুণ, চারগুণ, এমন কি আটগুণ পর্যন্ত বাড়তি ভার সৃষ্টি করতে পারে।

এই রকম বাড়তি ভারটা খুবই ক্ষতিকর। এই বাড়তি

ভার দৃষ্টি এবং শ্রবণেন্দ্রিয় এবং কার্ডিয়োভ্যাসকুলার সিস্টেম বা হৃদপিণ্ডের শিরা এবং ধমনী ব্যবস্থার উপর খুব মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে সুশিক্ষিত বৈমানিকদেরও খুবই কষ্ট পেতে হয়।

গ্রহান্তরগামী বিমানে বাড়তি ভারের উদ্ভব হয় ওড়া শুরু করার সময়, যখন এঞ্জিনটা রকেটটাকে চালাতে থাকে। ইনারশিয়া বা জাড্যের শক্তি বাড়তি ওজন সৃষ্টি করে যাত্রীদের মেঝের সঙ্গে আটকে ধরে থাকে। গতিবেগ বৃদ্ধির হার যত বেশি হবে, আকর্ষণের শক্তির তুলনায় বাড়তি ওজনও ততই বেশি হবে। এ থেকেই বাড়তি ভারের উদ্ভব হবে। বাড়তি ভার কম করতে হলে খুব স্বচ্ছন্দভাবে এবং ক্রমে ক্রমে বিমানটির গতিবেগ অর্জন করা দরকার।

এদিকে জালানি কম খরচ করার জন্য গতিবেগ বৃদ্ধির হারকে যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। এই দুই পরস্পরবিরোধী সমস্যার সমাধান করার দরকার হয়ে পড়ল।

আমাদের ল্যাবরেটরীতে আমরা বাড়তি ভারের ব্যাপারটা নিয়ে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করেছিলাম। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এই বাড়তি ভারটা সবচেয়ে ভালভাবে সহ্য করা যায়, মানুষ যদি চিৎ হয়ে পড়ে থাকে, আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে যদি বাড়তি ভারটা বুকের দিক থেকে পিঠের দিকে ক্রিয়া করতে থাকে। এর উল্টো অবস্থায় পিঠের দিক থেকে পেটের দিকে ক্রিয়া হলে এতে বাড়তি ভারটা তিন ভাগ কমে যায়। একজন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা লোকের

পক্ষে যতটা ভার মনে হবে তার চেয়ে অনেক বেশি মনে হবে একজন বসে থাকা লোকের। তিনগুণ বেশি কষ্ট হবে যদি বাড়তি ভারটা মাথার দিক থেকে শরীরের দিকে ক্রিয়া করে, আর পাঁচগুণ বেশি কষ্ট হবে যদি ভারের ক্রিয়াটা শরীরের দিক থেকে মাথার দিকে হয়।

চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটি মানুষ কোনরকম কষ্ট অনুভব না করেই তিন মিনিটে তিন দফা বাড়তি ভার সহ্য করতে পারে। এই পরিমাণটিকেই ভিত্তি ধরে হিসাব করা হয়েছে। এই জন্যই এঞ্জিন এবং পথের সমস্ত হিসাব এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে বাড়তি ভার তিন দফার বেশি না হয়। বিমানটা যখন কার্যরত এঞ্জিনগুলির গতিবেগ বৃদ্ধির হার অনুযায়ী চলতে থাকবে যাত্রীরা তখন বাড়তি ভার ঠেকানোর জন্য তৈরি বিশেষ ধরনের ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকবে। এই সময় যে সমস্ত লোকের পৃথিবীতে ওজন ছিল ৭০ থেকে ৮০ কিলোগ্রাম, রকেটের ওজনের যন্ত্রে তাদের ওজন দাঁড়াবে তিনগুণ বেশি—প্রায় চার টনের মত।

কিন্তু এঞ্জিন বন্ধ হল, ইনারশিয়া বা জাড্যজাত বাড়তি ভার রইল না। আর পৃথিবীর আকর্ষণ? যাত্রীদের উপর আকর্ষণের ক্রিয়া হবে ঠিকই কিন্তু তাতে ওজনের উদ্ভব হবে না। আগে বলা হয়েছে যে ওজনের উদ্ভব তখনই হয় যখন আকর্ষণটা কোন একটা স্থির প্রতিবন্ধকের সাথে আমাদের আটকে ধরে রাখে, যেমন ধরো ভূপৃষ্ঠ। কিন্তু রকেটটা তো আর স্থির প্রতিবন্ধক হচ্ছে না—পৃথিবীর আকর্ষণ এটাকে

নিচের দিকে টানছে আর যাত্রার শেষের দিকে চাঁদের আকর্ষণ টানছে চাঁদের দিকে। কোন শূন্যচারী বস্তুর আকর্ষণের ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত বস্তু তারই উপর গিয়ে পড়তে বাধ্য। পড়ন্ত বস্তুটি চলতে থাকবে কিনা অথবা কাছে এগিয়ে আসবে কিনা, এটা নির্ভর করবে তার প্রারম্ভিক গতিবেগের উপর। পড়ন্ত রকেটটার সঙ্গে যাত্রীরাও পড়তে থাকবে। তখন আকর্ষণ থাকবে কিন্তু আটকে ধরে রাখবার শক্তি থাকবে না এবং ওজনও থাকবে না। যখন এঞ্জিনটা কার্যরত থাকবে না তখন আকর্ষণও প্রায় থাকবে না, দুদিন ধরেই। মানুষ তাহলে কি করে এ অবস্থাটা সহ্য করবে?

ওজনহীনতার অবস্থায় মানুষ আসে খুব কমই। খাড়া হয়ে নামতে-থাকা লিফ্‌টের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য—এই দুই কি এক সেকেণ্ডের জন্য ওজন প্রায় নাও থাকতে পারে। এই সময়টা খুবই অস্বাচ্ছন্দ্যকর মনে হয়। উড়োজাহাজের মধ্যে কিন্তু ওজন থাকে, কারণ উড়োজাহাজ বাতাসের ওপর ভর করে থাকে এবং পৃথিবীর উপর পড়ে যায় না। প্যারাসুটের দ্বারা অবতরণকারীরাও ওজন অনুভব করে থাকে; কারণ বাতাস তাদের পতন ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু বহু উচ্চে আয়নোস্ফিয়ার দিয়ে যাতায়াতকারী উড়োজাহাজে ১০ থেকে ২০ মিনিট কি তারও বেশি সময় ওজন থাকে না। এই উড়োজাহাজগুলি যাত্রারম্ভের সময়েই উচ্চতা এবং গতিবেগ অর্জন করে ফেলে, তারপর এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়। আর সেই মুহূর্তটি থেকে ওজন একেবারেই থাকে না। ওজনটা আবার

ফিরে আসে যখন বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম ঘনস্তরে গিয়ে আবার বাতাস পতনটা রোধ করা আরম্ভ করে। আসলে এই ধরনের উড্ডয়নগুলি হল ছোটখাট গ্রহান্তর যাত্রা, যার প্রেরক স্টেশন এবং গন্তব্য স্টেশন দুটোই পৃথিবীতে অবস্থিত।

এই সব বিমানযাত্রায় দেখা গেছে যে ওজনহীনতার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়নি এবং এটাও দেখা গেছে যে মানুষের মূল দেহযন্ত্রগুলি যথা হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, মাংসপেশী, গ্ল্যাণ্ড্ ইত্যাদির কাজ মাধ্যাকর্ষণের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ওজনহীনতাটা যে একেবারেই বোঝা যায় না তা নয় এবং সবার আগে এটার প্রতিক্রিয়া হয় ভারসাম্য বজায় রাখার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উপরে।

আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করে একটা 'ভেষ্টিবুলার' যন্ত্র। এটা হচ্ছে কানের ভিতর যাকে বলা হয় ল্যাবিরিন্থ বা সুড়ঙ্গ পথ সেইখানে অবস্থিত। এই ল্যাবিরিন্থ বা সুড়ঙ্গ পথটা তিনটা অংশ নিয়ে গঠিত—একটা হল 'শ্রবণ পর্দা', অন্য দুটো হল প্রবেশদ্বার (ল্যাটিন ভাষায় যাকে বলা হয় 'ভেষ্টিবুল') আর অর্ধবৃত্তাকার কয়েকটা খাদ এই দুটো প্রবেশদ্বারের যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত।

এই যন্ত্রটা মানুষকে মহাশূন্যের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে। এটি খুবই জটিলভাবে নির্মিত। তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খাদ তিনটি পারস্পরিকভাবে খাড়া করা দেওয়ালের মধ্যে সাজানো রয়েছে। এর সবগুলিই একটা তন্তুময় তরল পদার্থ দিয়ে ভর্তি থাকে।

মাথাটা যখন নড়াচড়া করবে তরল পদার্থটা তখন ইনারশিয়া বা জাড্যের শক্তির প্রভাবে দেওয়ালের পেছন দিকে পড়ে খাদের মধ্যেকার অনুভূতির তন্তুগুলির দিকে সরে আসে। কিন্তু ইনারশিয়া বা জাড্যের শক্তির উপর ওজন নির্ভর করে না, এই যন্ত্রটা তাই ওজনহীনতা নষ্ট করতে পারে না।

প্রবেশদ্বারের (ভেষ্টিবুলের) মধ্যে অবস্থিত সংবেদনশীল 'অটোলাইট' যন্ত্রটি কিন্তু অন্যরকম। এখানে সেই একই তন্তুময় তরল পদার্থে ভর্তি ছোট্ট কয়েকটা থলে আছে ; এর মধ্যেই অটোলাইট, অর্থাৎ কার্বনিক এসিডের স্ফটিকাকৃতি চূর্ণগুলি ভাসতে থাকে। অটোলাইটগুলি তরল পদার্থটা থেকে একটু বেশি ভারি এবং খুব আস্তে আস্তে অনুভূতির পিঞ্জরটিকে একটু একটু চাপ দেয় এবং মহাশূন্যের অবস্থার মধ্যে মাথা এবং শরীরের অবস্থানটা জানিয়ে দেয়। এখানে অবশ্য ওজনের গুরুত্ব আছে। মানুষের সঙ্গে অটোলাইটগুলিও ওজন হারিয়ে ফেলে এবং অনুভূতির পিঞ্জরের উপর গিয়ে আর আঘাত করে না, মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে ভুল সংবাদ দেয়, স্নায়ুযন্ত্রকে নির্জীব এবং এলোমেলো করে দেয়। আয়নোস্ফিয়ার দিয়ে যাতায়াত-কারী যাত্রীদের অনেকের মাথাধরা, বমি বমি ভাব, পেটকাঁপা ইত্যাদি দেখা গিয়েছিল।

চাঁদে অভিযানের সময় ওজনহীনতা দুদিন স্থায়ী হবে। ফলে সমুদ্রপীড়ার মত প্রায় একই রকমের "গ্রহান্তর পীড়াও" হতে পারে।

সমুদ্রপীড়া স্বাভাবিকভাবে কিংবা ওষুধে সেরে যায়।

তাছাড়া কিছু কিছু ভাগ্যবান লোক আছে যারা ঢুলুনিতে অভ্যস্ত। আচ্ছা, বিশেষ কোনো শিক্ষার দ্বারা কি 'গ্রহান্তর-পীড়া'কে এড়ানো যায়? এ প্রশ্নটার গুরুত্ব শুধু যে চাঁদে অভিযানের সম্পর্কেই তা নয়, শুক্র এবং মঙ্গল গ্রহে ভবিষ্যৎ অভিযানের দিক থেকেও এর গুরুত্ব রয়েছে। কারণ সে ক্ষেত্রে দুদিন নয়, কয়েক মাস এই পীড়া স্থায়ী হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রহান্তরগামী বিমানটিকে জোর করে আবর্তিত করে কৃত্রিম ওজন সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে যে উৎকেন্দ্রিক শক্তির উদ্ভব হবে সেটা যাত্রীদের দেওয়ালের সঙ্গে আটকে ধরে রাখবে। কিন্তু এরকমভাবে সমস্যার সমাধান করা যান্ত্রিক দিক থেকে খুবই জটিল এবং ঝামেলার ব্যাপার হবে এবং তাই সেরকমটা না করতে হলেই ভাল। চাঁদে অভিযানই দেখিয়ে দেবে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কি নেই। কাজেই বুঝতে পারছ কতটা অধীর হয়ে এই অভিযানের ফলাফলের অপেক্ষা করছি।

প্রথম দশ মিনিট

অভিযানে অংশগ্রহণকারী ডাঃ ত, আ, আকোপিয়ানের
পাঠানো রিপোর্ট।

ভূমণ্ডলের অধিবাসীবৃন্দ! গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্য থেকে আপনাদের আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। 'প্রিয় ভূমণ্ডলের অধিবাসীবৃন্দ'—দশ মিনিট আগে পৃথিবীর মাটি ছেড়ে এসে আমরা বিশেষ অনুভূতি নিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করছি।

দশ মিনিট—কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। পরপর এখন সেটা বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

দশ মিনিট আগেও আমরা কাজবেকের পাদদেশে আপনাদের মধ্যেই ছিলাম। বিশেষ ধরনের পোশাক পরে আমরা বসেছিলাম কেবিনের ভিতরে; যে যার নিজের জায়গায় নরম ইজিচেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। আমাদের চোখের সামনে ছোট ছোট আলো লাগানো বোর্ড। বিমানের যান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি সহ তামারিনের বোর্ডটা হল প্রকাণ্ড—আমারটা হল একটা ছোট স্ট্যাণ্ড। এর দিকে তাকালেই আমি দেখতে পাব আমাদের তাপমাত্রা স্বাভাবিক আছে কিনা, বাতাসটা পরিষ্কার কিনা, বায়ুর আর্দ্রতা যথেষ্ট পরিমাণ কিনা এবং ডাক্তার আকোপিয়ানের নাড়িটা দ্রুত চলছে কিনা। অবশ্য অন্য যাত্রীদের নাড়ির গতিবেগও ওঠানামা করছে। ওরা অস্বীকার করুক তো যে ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়েনি! ওদের উত্তেজনা ছোট ছোট বাতিগুলির সাহায্যে ধরা পড়ে গেছে এবং লেদের স্বয়ংক্রিয় লিখন যন্ত্রে লেখাও হয়ে গেছে।

আচম্‌কা কড়্‌কড়্‌ আওয়াজ উঠল, তারপর গর্জন শোনা গেল; প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেলুম। একটা প্রচণ্ড শক্তি আমাকে ইজিচেয়ারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারটার দিকে টানতে লাগল, চেপে ধরল আমার বুক। কানে তালা ধরে গেল; হাল ছেড়ে দিয়ে আমি মুখ দিয়ে বাতাস নিলুম। মোটাসোটা কয়েকটা জোয়ান লোক যেন আমাকে চেপে ধরেছে। ভেবে দেখুন, আপনাদের যখন ৫ কিলোগ্রাম ওজন বেশি হয় তখন

কিরকম বুক ধড়ফড় করে। আর এই যাত্রারম্ভের পরমুহূর্তেই আমার ওজন বেড়ে গিয়ে ১৪০ কিলোগ্রাম অর্থাৎ তিনগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু আগেকার শিক্ষাটা কাজে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি সামলে উঠলুম, ভারি মাথাটা ফেরালুম জানালার দিকে।

মনে হল একেবারে খাড়া চড়াই বেয়ে উঠছি। কিন্তু তা নয়, আমার অনুভূতিটাই হচ্ছে ভুল। গ্রহান্তর যাত্রায় সাধারণত অনুভূতিগুলিকে বিশ্বাস করা অসম্ভব। এরকম মনে করা অস্বাভাবিক নয়। এঞ্জিনটার শক্তি যখন মাধ্যা-কর্ষণের শক্তির চেয়েও বেশি এবং যতক্ষণ এটা কাজ করে চলবে, ততক্ষণ সারাক্ষণই মনে হবে রকেটটা সিধে ওপরের দিকে উড়ে চলেছে।

ঐ ত! চক্‌চক্ করে উঠছে গোলাকৃতি পাহাড়ের চূড়োটা। দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল এক বিস্তীর্ণ দৃশ্যপট,— ফাটল ধরা, ভাঙ্গাচোরা ভূপৃষ্ঠ, পর্বতশ্রেণী, কোণাকৃতি ঢিবি, কুয়াশা ঢাকা সঙ্কীর্ণ গিরিখাদ। আমরা বেগে উঠে যাচ্ছি ওপরের দিকে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক আস্তে উঠছি। নীল্‌চে কুয়াশা ঢাকা পাহাড়গুলি ছড়ানো রয়েছে নিচে। তারপর ধোঁয়ার উপর যেন একটা উর্ধ্বসীমা দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে; তার পরে আরো উজ্জ্বল নীল রঙ; পৃথিবীর আকাশের মত একেবারেই নয়।

সেই নীল রঙটা ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে সমুদ্রের গাঢ়

নীলে পরিণত হচ্ছে তারপর তাতে লাগছে বেগুনি রংয়ের আভা, তারপর সেটাও হয়ে যাচ্ছে কাল্‌চে বেগুনি। আমরা এখন আছি ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মাঝে বায়ুমণ্ডলের একটু উপরের স্তরে। আসতে সবশুদ্ধ লেগেছে মাত্র এক মিনিট।

দ্বিতীয় মিনিটটি শেষ হলে উচ্চতা অর্জন করা হয়ে যাওয়ার পর রকেটটি মোড় ঘুরবে পূবের দিকে। আমাদের মনে হচ্ছে যে রকেটটা খাড়া উঠে যাচ্ছে এবং এমনকি পড়েও যাচ্ছে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের ভুল ধারণা। আসলে পৃথিবী রয়েছে আমাদেরই নিচে।

দূরে সরে যাচ্ছে দাঘেস্তানের কুয়াশা ঢাকা অচেনা পর্বতমালা আর গিরিখাতগুলি। তারপর একটা সমতল, অন্ধকার ছোপ। এর চেহারাটা খুবই চেনা ; এ হল কাস্পিয়ান সাগর। ছুঁচোলো 'আপশেরন' উপদ্বীপ, ছাড়া ছাড়া 'কারাবো গাছ' এইসব, নিয়ে এর পুরোটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সামনে রয়েছে একটা জীবন্ত ম্যাপ। ম্যাপটা অবশ্য পরিষ্কার নয়, মেঘে ঢাকা। ম্যাপটা গড়িয়ে চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে। আমি এখন 'গড়িয়ে যাওয়া' শব্দটা ব্যবহার করলাম। সমুদ্রটা আমাদের কাছে এখন মনে হচ্ছে সাধারণ একটা অন্ধকার সমতলভূমি এবং এই সমতলভূমিটা আধ মিনিটের মধ্যেই পার হয়ে যাব।

সবই খুব উত্তেজনাপ্রদ এবং অসাধারণ। তাকাচ্ছি আর চেষ্টা করছি সবকিছু দেখতে এবং মনে করে রাখতে। কাস্পিয়ানের উপর বরফ নেই ; মরুভূমিটাকে লাল্‌চে দেখাচ্ছে।

তারপর আবার একটা অন্ধকার সমতল ভূমি—আরল সাগর। এর সঙ্গে এসে মিলেছে একটা ধূসর রঙের ফালি—আমুদরিয়া নদীর সেচকার্যের জন্য বাঁধা পাড়টা। এগুলির দিকে তাকাচ্ছি এবং চেষ্টা করছি মঙ্গলের তথাকথিত খাল-গুলির সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করার। সম্ভবত সাদৃশ্য আছে অনেক, লাল পশ্চাৎপটের উপর একটা সবুজাভ ফালি।

পৃথিবী বহুদূরে, এখনও সেটা থালার মত লাগছে না। একফালি কুয়াশার পাড় দেওয়া পৃথিবীর গোল কিনারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দিগন্তটা বহু বিস্তৃত এবং সহজেই মানিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় সাতমিনিট ধরে গর্জন করতে করতে রকেটটা এই রঙীন ঝলমলে ম্যাপটার উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ। এঞ্জিন বন্ধ করা হল। ক্যাপ্টেনের টেবিলের উপর ১০৭—এই সংখ্যাটা ফুটে উঠল। প্রারম্ভিক গতিবেগ অর্জন করা হয়েছে। আকর্ষণ অনেকটাই কমে গেছে। আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছি আমরা .....পড়ছি—পড়ছি।... মাথা ঘুরছে, বমি বমি লাগছে, ইজিচেয়ার থেকে ছুটে চলে যেতে চাইছে হাত দুটো। কোন দিকে উড়ে চলেছি আমরা? জানলার বাইরে সবই এক রকম। মরুভূমিটা লাল্‌চে রঙের, তিয়ান্‌-শান পাহাড়ের উজ্জ্বল রেখাটা দ্বিখণ্ডিত করেছে তাকে। এই ভাবেই আরম্ভ হল ওজনহীন পঞ্চাশ ঘণ্টা পথের যাত্রা। ওজনহীনতার সঙ্গে এখন খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার নিজেদের।

এতসব ঘটে গেল আমাদের মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে। আর এই প্রথম অভিজ্ঞতাগুলো চটপট বর্ণনা করে যেতে আমার দশ মিনিটই লেগে গেল। আপনাদের ককেশাসের সময় অনুযায়ী ১০টা বেজে ২০ মিনিট। আমাদের ঘড়িতে কটা বাজে বলা মুশকিল। আমরা এরি মধ্যে কাজবেক থেকে দশ হাজার কিলোমিটার উড়ে চলে এসেছি। আমাদের পেছনে ডানদিকে চোখ-ধাঁধানো জ্বলন্ত সূর্য আর সামনে হল চাঁদ—পৃথিবীতে আমরা একে যেমন দেখি ঠিক তেমনি। কালো তারকা খচিত আকাশের পশ্চাৎপটের উপর রয়েছে

সূর্য আর চাঁদ। কিন্তু তারাগুলোর কথা বলা যাবে পরে, এখন নয়। আমাদের পেছনে বাঁ দিকে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হল ভূমণ্ডল। ৩০০০ হাজার কিলোমিটারের উচ্চতা থেকে আমরা তার দিকে তাকিয়ে দেখছি। আকাশের এক চতুর্থাংশ

জুড়ে রয়েছে পৃথিবী। মনে হচ্ছে গ্রহটিকে সামগ্রিক ভাবে দেখবার পর এখনই শুধু বুঝতে পারছি যে এটা কত বড়। পৃথিবীর বাঁ দিকটা চক্‌চক্‌ করছে, তার মানে পৃথিবী এখন সূর্যালোকে আলোকিত কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যেন কিরণ দিচ্ছে পৃথিবীই। আমাদের ঠিক সামনেই সুদূর প্রাচ্য এবং জাপান, আরো পূবে—একটা ঘন অন্ধকার। পৃথিবীর যে অর্ধেক অংশটি আলোকিত নয় সেটা আকাশের থেকেও বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে। আর পশ্চিম থেকে সারা প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে যেন জ্যোৎস্নার একটা কমলা রঙের কার্পেট বিছানো রয়েছে। বন্ধুগণ, উপর থেকে সমস্ত পৃথিবীটাকে একসঙ্গে দেখে নেওয়ার এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না। ...এই সুদীর্ঘ বার্তা এবার আমরা শেষ করছি। পরে গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে পৌঁছে অল্পস্বল্প যা দেখব তা সব কিছুই তখন লিখে রাখব।

পৃথিবী থেকে চাঁদের পথে

'এল' প্রতিষ্ঠানের পথের হিসাবকারী দলের প্রধান,—

অধ্যাপক **গ, ন, কস্ত্রোমিন্‌**

চন্দ্রে অভিযানের জন্য গ্রহান্তরগামী বিমানের পরিকল্পনা করা এবং বিমানটি নির্মাণ করা—শুধু এইটুকুই যে আমাদের নির্মাণ-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল তা নয়। এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল নির্মাণকারীদল এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের পথটির হিসেব-নিকেশ করার জন্য আরেকটা দল। আমরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক

মানমন্দিরগুলি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইনস্টিটুটগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করছি।

পৃথিবী থেকে চাঁদের গমন পথটির সঠিক হিসেবনিকেশ করার ব্যাপারটা একটা খুব জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এপথে যে বহু বাধা রয়েছে তা বোঝা গিয়েছিল।

বোঝা গিয়েছে বিমানটি যে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাবে সেখানে আকর্ষণের শক্তিগুলি ক্রিয়া করতে থাকবে। পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ এবং গ্রহপুঞ্জ—সবগুলিরই আকর্ষণই থাকবে বিমানটির উপর। যদি এইসব আকর্ষণ-শক্তিগুলি না থাকত তবে পৃথিবী থেকে যাত্রারম্ভ করার সময় বিমানটি যে পরিমাণ গতিবেগ অর্জন করত তা দিয়েই সরল রেখা ধরে এটি লক্ষ্য পর্যন্ত উড়ে যেতে পারত। আকর্ষণের শক্তিগুলি মহাশূন্যে ভ্রমণপথকে বাঁকিয়ে গোলাকার করে তুলছে এবং একটি জটিল বক্ররেখায় একে চালিত করে দিচ্ছে।

এই আকর্ষণগুলিকে হিসেব করা সহজ হত যদি বিমানটি একই সঙ্গে আকাশচারী সমস্ত বস্তুপিণ্ডের দ্বারা আকর্ষিত না হয়ে পর্যায়ক্রমে আকর্ষিত হত। যেমন ধরো বিমানটি সমস্ত সময়েই যদি পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে উড়ে যেত তবে এর মহাশূন্য উড্ডয়ন-পথের হিসেব করতে কোন অসুবিধাই হত না। যদি শুধু সূর্যের বা শুধু চাঁদের আকর্ষণ ক্ষেত্র হত তাহলেও ব্যাপারটা সহজ হত। এই রকম উড্ডয়নের হিসেব করা খুবই সহজ। এসব ক্ষেত্রে জ্যোতির্বলবিভার নিয়ম অনুযায়ী বিমানটা নিম্নলিখিত যে কোন একটা

বক্রতা অনুসরণ করে উড়ে যেতে পারত (এগুলিকে কনিক্-সেক্শন বা শঙ্কু খণ্ড বলে) যথা : বৃত্ত, এলিপস্ বা উপবৃত্ত, প্যারাবোলা বা পরাবৃত্ত এবং হাইপারবোলা বা অধিবৃত্ত। প্রথম মুহূর্তটিতে বিমানের গতিবেগ জানতে পারলেই তার সুদীর্ঘ পথের হিসাব খুব সহজেই করে ফেলা যায়।
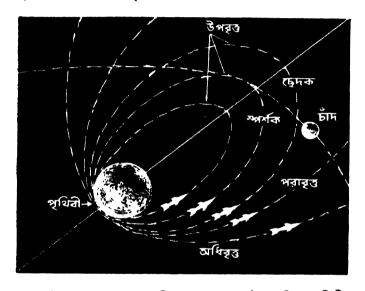
যাই হোক, আমাদের বিমানের পথের উপর কিন্তু পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলি—সকলেরই প্রভাব পড়বে।

এসব প্রশ্নের সঠিক সমাধান বৈজ্ঞানিকরা এখনো জানেন না। তাই চাঁদে যাওয়ার সমস্ত পথটাকে কল্পনায় দুটো প্রধান অংশে ভাগ করা হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে এই দুটো

ভাগের প্রত্যেকটিতে একটিমাত্র আকর্ষণ ক্ষেত্র আছে, হয় পৃথিবীর আকর্ষণ, নয় চাঁদের আকর্ষণ। এই দুই আকর্ষণের মধ্যে যেটি শক্তিশালী তার উপর নির্ভর করেই হিসাব করা হয় বিমানটি কোন ভ্রমণ-পথে চলবে। তারপর প্রথম দফায় অন্যান্য আকর্ষণক্ষেত্রের বহু গৌণ পরিস্থিতি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। এই সমস্ত গৌণ প্রভাবগুলি বা যাকে 'ব্যাঘাত' বলা হয়ে থাকে—সেই ব্যাঘাতগুলির সঙ্গে প্রাথমিক হিসাবটির কিছু পরিবর্তন হয়। এই রকমভাবেই সামান্য একটা ব্যাপার থেকে একটা জটিল হিসাব এসে দাঁড়ায়। আর যদি আমরা এই সব ব্যাঘাতগুলিকে হিসাবের মধ্যে না ধরি, তবে বিমানটা লক্ষ্যপথ থেকে এত দূরে সরে যাবে যে আবার তাকে ঠিক পথে আনতে অযথা অনেক জ্বালানি খরচ হয়ে যাবে। এটা তবু খানিকটা ভাল···

কিন্তু পৃথিবী থেকে চাঁদের উড্ডয়নের পথে ফিরে আসা যাক। পৃথিবীতে ভ্রমণ করবার সময় জল কিংবা স্থল যাই সামনে পড়ুক না কেন সাধারণত বহু রকমের পথেই আমরা যেতে পারি। হয় আমরা বেছে নেই সবচেয়ে সোজা পথটি, নয় তো সবচেয়ে ভাল পথটি। হয় সবচেয়ে কম খরচের পথে আমরা যাই, নয় তো সবচেয়ে আরামের পথে যাই; আমাদের বেছে নিতে হয় তাড়াতাড়ির পথ অথবা সবচেয়ে সঠিক পথ।

গ্রহান্তর যাত্রার ব্যাপারেও কোন্ পথে যাব তা আমাদেরই বেছে নিতে হয়েছিল। যাত্রারম্ভ এবং যাত্রাশেষের বিন্দু দুটিই শুধু আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বহু রকমের ভিন্ন ভিন্ন

পথে এই যাত্রা সম্ভব। কেননা, পথগুলি সবই হচ্ছে মহা-শূন্যের মধ্য দিয়ে, ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে নয়; কাজেই অনেক রকমের পথের সন্ধান পাওয়া খুবই সম্ভব।

এই রকমের বহু পথরেখার মধ্য থেকে কোন্ পথটি বেছে নেব? বোঝাই যাচ্ছে যে সবকটা পথেই উড্ডয়নের অবস্থাটা রয়েছে একই রকম—সব পথেই রয়েছে সম্পূর্ণ বস্তুশূন্যতা এবং পৃথিবী-সমীপবর্তী মহাশূন্যের ঠাণ্ডা; সব পথেই উল্কাপিণ্ডের সামনে পড়ে যাওয়ার বিপদ রয়েছে। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের দিকে উড়ে যেতে হবে এবং সবচেয়ে কম জ্বালানি খরচ করতে হবে—শুধু এই ব্যাপারটা ছাড়া আর সব বিষয়েই সব পথেরই তো একই অবস্থা।

কিন্তু তাহলেও রাস্তা বেছে নেওয়াটা খুবই শক্ত নয়। যেপথে সময় লাগবে কম এবং জ্বালানিও খরচ হবে কম সেই পথই হল সবচেয়ে ভাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মূল প্রশ্ন উঠবে এরকম পথই যে নেই। উড়বার সময় যত কম হবে তত বেশি হবে জ্বালানির খরচ,—গ্রহান্তর যাত্রার এই হল নিয়ম।

উড্ডয়নের জন্য যত বেশি জ্বালানি আমরা খরচ করতে পারব তত তাড়াতাড়ি উড্ডয়ন শেষ হবে। অবশ্য উচ্চ গতিবেগে উড্ডয়নের কথা ভাবার এখনও সময় আসেনি। আমরা এই সবে বেরিয়েছি গ্রহান্তরের পথে। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে কম জটিল পথে চাঁদের দিকে যাত্রার ব্যবস্থা করছি আমরা কোন রকমে। এই উড্ডয়নটা যাতে সফল হতে পারে সেজন্য বিমানের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানির জায়গা

করেছি আমরা বহু কষ্টে। যাই হোক, এই প্রথম স্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হোল এমন একটা পথ বেছে নেওয়া যে-পথে যেতে গেলে খুব কম জালানিই খরচ হবে।

এখন দেখা দরকার বিমানটি কোন বক্ররেখায় উড়লে জালানির খরচ সবচেয়ে কম হবে—এলিপ্‌স্‌ অর্থাৎ উপবৃত্ত, না প্যারাবোলা অর্থাৎ পরাবৃত্ত? অথবা হাইপারবোলা বা অধিবৃত্ত?

আমাদের জানা আছে যে পৃথিবী থেকে যাত্রারম্ভ করার সময় বিমানটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিবেগ পেলে প্যারাবোলা বা পরাবৃত্তের পথ ধরে উড়তে থাকবে; বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিবেগকে যে 'পরাবৃত্তধর্মী' গতিবেগ বলা হয় তা এইজন্যই। পরাবৃত্তের পথে উড়লে বিমানটি পৃথিবী থেকে বহুদূরে অনন্ত-কাল ধরে ঘুরতে থাকবে এবং কেবল একটা জায়গায় এটা চাঁদের কক্ষপথটিকে ছেদ করবে। এখন শুধু দরকার যাতে ঠিক ঐ জায়গাটিতে গিয়েই বিমানটির চাঁদের সঙ্গে দেখা হয় সেই হিসাব করে বিমানটির যাত্রারম্ভের সময়ও তার উড্ডয়নের দিক নির্ণয় করা।

যদি যাত্রারম্ভের সময় বিমানের গতিবেগ 'বিচ্ছিন্নতার গতিবেগ' থেকে বেশি হয় তবে বিমানটির গতিবেগ আর পরাবৃত্ত রেখায় হবে না। এখন এটার পথ হবে অন্য বক্ররেখায়। এই পথ ধরে গেলে বিমানটি চলে যাবে অনন্তের দিকে। এই পথটাই হল অসংখ্য অধিবৃত্তের একটা। বিমানের প্রারম্ভিক গতিবেগ যত বেশি হবে ততই 'উন্মুক্ত' হবে অধি-

বৃত্তটি ; ততই চাঁদের দিকে বিমানের পথটা সোজা চলে যাবে এবং পথটা ছোট হয়ে আসবে। এই পথেই ভবিষ্যতের উচ্চগতিসম্পন্ন গ্রহান্তরগামী বিমানগুলি যাবে। সেগুলি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ এখন আমাদের কাছে স্বপ্ন মাত্র ; কেননা, এর জন্য যাত্রারম্ভের সময় যে প্রচণ্ড গতিবেগ বিমানটির দরকার সে গতিবেগ নিয়ে দেওয়া আমাদের ক্ষমতায় কুলোবে না। অতএব অধিবৃত্তকে যে বাদ দিতেই হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু পরাবৃত্তের পথ ধরে না উড়লে যে হবে না তাও নয়। যাত্রারম্ভের সময় বিমানের চূড়ান্ত গতিবেগ যদি বিচ্ছিন্নতার গতিবেগের চেয়ে সামান্য একটু কম হয় তার কি হবে? এ রকম হলে বিমানটি কিন্তু প্যারাবোলা বা পরাবৃত্তের পথ ধরে যাবে না। এ রকম হলে উড্ডয়নপথটি হয়ে দাঁড়াবে এলিপস বা উপবৃত্ত। উপবৃত্ত কিন্তু পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্তের মত খোলা-মুখ বক্ররেখা নয়। উপবৃত্ত বৃত্তের মতই বন্ধমুখ। এর মানে হলো এই যে বিমানটি যদি উপবৃত্ত ধরে পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে তবে শীঘ্র হোক বা দেরিতে হোক তা আবার পৃথিবীতেই ঘুরে চলে আসতে বাধ্য। এই জন্যই পরাবৃত্তের পথে মহাশূন্য-ভ্রমণ খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এটা হচ্ছে বন্ধমুখ (উপবৃত্তধর্মী) এবং খোলা-মুখ (অধিবৃত্তধর্মী) মহাশূন্য ভ্রমণপথের মাঝামাঝি একটা।

যাত্রারম্ভের সময় বিমানটি যে গতিবেগ অর্জন করবে যদি সেটা বিচ্ছিন্নতার গতিবেগের থেকে কম হয় তবে বিমানটি

পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত উপবৃত্তধর্মী কক্ষপথ দিয়ে ওড়া আরম্ভ করবে। অতএব এক্ষেত্রেও বিমানটি অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্তের সময়ের মতই চাঁদের কক্ষপথটিকে ছেদ করবে এবং যদি সমস্ত কিছু সঠিকভাবে হিসাব করা হয়ে থাকে তবে ঐ ছেদবিন্দুতেই চাঁদের সঙ্গে এটার সাক্ষাৎকার ঘটবে। এই জন্যই এরকম উপবৃত্তকে বলা হয় ছেদক।

এখন আমরা বিমানের প্রারম্ভিক গতিবেগ আস্তে আস্তে কমাব। গতিবেগ কমানোর দ্বারা পৃথিবী থেকে বিমানটির যে ব্যবধান হয়েছে তা কমিয়ে আনব। ব্যবধান বলতে বোঝাচ্ছে বিমানটি যখন উপবৃত্তের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে সেখান থেকে পৃথিবীর ব্যবধান। আমরা নিশ্চয়ই চাই যে বিমানের গতিবেগ কমুক, জালানি খরচও কম হোক। কিন্তু, বিমানটি চাঁদে গিয়ে পৌঁছতে হলে বিচ্ছিন্নতার গতিবেগের তুলনায় বিমানের যাত্রারম্ভের গতিবেগ কতটা কমাতে হবে তা হিসাব করা দরকার।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এরকম সীমাবদ্ধক্ষেত্রে উপবৃত্তের পথ ধরে উড্ডয়নটা চাঁদের কক্ষপথকে ছেদ করবে না, শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করবে মাত্র। (এ রকম উপবৃত্তকে এই জন্যই বলা হয় স্পর্শক)।

কিন্তু এরকম ধারণা ভুল। বিমানের যাত্রারম্ভের গতিবেগ আরো কম করলেও বিমানটা চাঁদে পৌঁছুবে। গতিবেগ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যে উপবৃত্তের পথ ধরে বিমানটা উড়ে যাবে সেটা চাঁদের কক্ষপথকে স্পর্শ করবে না, সে পথে চাঁদের

সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে না। এই রকমই ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে না কি ?

হাঁ, ব্যাপারটা তাই হত যদি চাঁদের নিজের একটা আকর্ষণ-ক্ষেত্র না থাকত। কিন্তু চাঁদ হল একটা প্রকাণ্ড আয়তনের আকাশচারী বস্তুপিণ্ড যার আকর্ষণ শক্তিও যথেষ্ট। উদাহরণ-স্বরূপ দেখান যায় যে চাঁদ থেকে ৪০,০০০ হাজার কিলো-মিটারের দূরেও চাঁদের যে আকর্ষণ শক্তি তা পৃথিবীর চেয়ে বেশি। কাজেই বিমানটাকে এই আকর্ষণের অঞ্চলটাতে পৌঁছে দিতে পারলেই যথেষ্ট। বিমানটি এখানে এসে পড়লেই তখন আর এটা উপবৃত্তের পথে পৃথিবীতে ফিরে না গিয়ে দিক পরিবর্তন করে চাঁদের দিকে ছুটে যাবে।

যদি পরাবৃত্তের পথ না ধরে সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ অর্থাৎ সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উপবৃত্তের পথ ধরে উড়ে যাওয়া যায় তবে কতটা জালানি বাঁচানো যাবে তাও দেখা যাক। এই রকম উপবৃত্তের পথ ধরে যদি উড়ে যেতে হয় তবে পৃথিবী থেকে যাত্রারম্ভের সময় বিমানের গতিবেগ বিচ্ছিন্নতার গতিবেগের চেয়ে (১১.২ কিঃ মি:) সেকেণ্ডে ১০০ মিটার কম হওয়া চাই অর্থাৎ হওয়া চাই সেকেণ্ডে ১১·১ কিলোমিটার। কিন্তু অন্যদিকে আবার বিমানটিকে পৃথিবী থেকে ৩৪০,০০০ কিলোমিটার দূরে অন্তহীনতার মধ্যে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য যাত্রারম্ভের গতিবেগকে সেকেণ্ডে ১০০ মিটার বাড়াতে হবে। এবং সেটা হচ্ছে একটা অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু এরি মধ্যে রয়েছে পৃথিবী-সমীপবর্তী মহাশূন্য-পথের

একটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য। বিমানটির প্রারম্ভিক গতিবেগ যদি বিচ্ছিন্নতার গতিবেগের কাছাকাছি হয় তা হলে এই গতি-বেগের সামান্যমাত্র বৃদ্ধিও বিমানটির দূরত্বকে বিরাটভাবে বাড়িয়ে দেয়। এরকম উদাহরণ আরো একটা আছে। যদি সেকেণ্ডে ১১.১ কিলোমিটার গতিবেগের সময় বিমানটি পৃথিবী থেকে ৩৪০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে যায়, তবে চাঁদের কক্ষপথ পর্যন্ত অর্থাৎ আরো ৪০,০০০ কিলোমিটার উড়ে যাওয়ার জন্য এর প্রারম্ভিক গতিবেগকে সেকেণ্ডে অন্তত ১০ মিটার বাড়িয়ে দিতে হবে। গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এক-সহস্রাংশ আর উড্ডয়নের দূরত্ব বাড়ে ৪০,০০০ কিলোমিটার।

এই সমস্ত হিসাব থেকেই আমরা স্থির করতে পারলাম যে চাঁদে গিয়ে পৌঁছতে হলে পৃথিবী থেকে যাত্রারম্ভ করার সময় বিমানটিকে যে ন্যূনতম গতিবেগ পেতে হবে তা হচ্ছে সেকেণ্ডে ১১.১ কিলোমিটার। 'চাঁদ—১' বিমানটির যাত্রার জন্য অধিকতর সুবিধাজনক উপবৃত্তের পথ ঠিক না করে, যাত্রারম্ভের উচ্চতর গতিবেগের সঙ্গে সংযুক্ত পরাবৃত্তের পথটি ঠিক করার ফলে কিছু জালানি বেশি খরচ হবে বটে, কিন্তু তাতে উড্ডয়ন কালকে ১১৫ ঘণ্টা থেকে ৫০ ঘণ্টায় কমিয়ে আনা যাবে। সবদিক থেকেই এটা করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অবশ্য এ গুরুত্ব শুধু প্রথম যাত্রার জন্যই।

'চাঁদ—১' বিমানটির পৃথিবীর দিকে ফিরতি যাত্রাটাও হবে পরাবৃত্ত-পথে, পরাবৃত্তের দ্বিতীয় শাখাটি ধরে।

বলাই বাহুল্য যে পৃথিবী থেকে বিমানটির যাত্রার মুহূর্তটি

খুব নিখুঁতভাবে গণনা করে আমাদের ঠিক করতে হয়েছে, যাতে নিজ কক্ষপথের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে বিমানটির চাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ফিরতি যাত্রায় অবশ্য যে কোন সময় চাঁদ থেকে যাত্রারম্ভ করা সম্ভব। যে উপবৃত্তের পথে চাঁদ পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমা করছে পৃথিবী সব সময়ই তারই কেন্দ্রস্থলে রয়েছে, কাজেই তাকে খুঁজে নেওয়ার দরকার হবে না। যাত্রারম্ভ করার সময় উড্ডয়নের যে দিকনির্ণয় করা হবে তা যাতে ভুল না হয়ে যায় তার জন্য ঠিক কোন্ মুহূর্তটিতে এঞ্জিন বন্ধ করে দিতে হবে সেটা স্থির করাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যে এখনো কোন পথ আঁকা নেই। কিন্তু আকাশ-ব্যবস্থার নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করে আমরা যে অদৃশ্য পথটি দেখিয়ে দিয়েছি "চাঁদ—১" বিমানটি সেই পথেই উড়ে যাবে।

উপগ্রহ কি রাখতেই হবে?—না, না রাখলেও চলবে…

"এল" প্রতিষ্ঠানের নির্মাণবিদ্‌দের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার

আ, ন, ওসিপোফ্

ভেলভেটের মত কালো আকাশে একটা উজ্জ্বল আলোর বৃত্ত। নক্ষত্রমণ্ডলীর পশ্চাৎপটের উপর এটাকে একটা ঝুলন্ত টায়ারের মত মনে হয়। এর আলোকিত দিকটা বাটির মত গোল আর উল্টো দিকটা রেলিং দেওয়া গম্বুজের মত। সৌর-

মণ্ডলের পথে প্রথম থামবার জায়গা, গ্রহান্তর গমনপথের মধ্যবর্তী স্টেশন, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহটিকে এই রকমই লাগবে দেখতে।

গোলাকার বাটিটা হলো সৌররশ্মি সংগ্রহ করার দর্পণ।

এর কেন্দ্রে রয়েছে সৌরবিদ্যুৎ স্টেশনের চুল্লী, উল্টোদিকে রয়েছে মানমন্দিরের গম্বুজ। এখানে মেঘ নেই, বাতাস নেই, তাই চাকাটাকে ঘুরিয়ে কৃত্রিম ওজন উৎপন্ন করতে হয়। বৃত্তটার ভিতরে রয়েছে অফিস এবং থাকবার জায়গা, হট্‌হাউস বা কৃত্রিম উপায়ে শাকসব্জী উৎপাদনের জায়গা এবং জ্বালানির ট্যাঙ্ক। পৃথিবী থেকে তৈলবাহী রকেট দিয়ে এখানে জ্বালানি নিয়ে আসা হয়। ঐ যে একটা রকেটকে নিচে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে আসতে। ওখান থেকে ধোঁয়ার কুয়াশায় ঢাকা পৃথিবীর ঢালু সীমানাটা দেখা যাচ্ছে। অন্য আরেকটা রকেট জ্বালানি বোঝাই করে নিচ্ছে, এটা অল্পক্ষণের মধ্যে চাঁদের দিকে উড়ে যাবে।

এসবই অবশ্য আমাদের নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবিতে আঁকা রয়েছে। দুঃখের বিষয় এখনো পর্যন্ত গ্রহান্তরবর্তী মহাশূন্যে এরকম কোন স্টেশন নেই।

"চাঁদ—১" বিমানের পরিকল্পনার আগে পর্যন্ত বহু বৎসর ধরে যে প্রচণ্ড যুক্তিতর্ক চলেছিল ছবিটার দিকে তাকিয়ে আমার সেগুলি মনে পড়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত যুক্তিতর্কের মূল কথাটা একটা প্রশ্নকেই উপলক্ষ করে—উপগ্রহ রাখা দরকার, না দরকার নয়? অন্যভাবে বলতে গেলে, পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য ছাড়াই উড্ডয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব, কি সম্ভব নয়?

গ্রহান্তর গমনকে সম্পূর্ণ করবার জন্য দুটো সম্ভাব্য উপায় ৎসিওলকভ্‌স্কি নির্ণয় করেন। একটা উপায় হল, পৃথিবীর

একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে জ্বালানি যোগানোর স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করা, আর অন্যটি হল গ্রহান্তরগামী বহুস্তর রকেট ট্রেনের সৃষ্টি করা। উপায় দুটোর সম্ভাবনা কতটা এবং সুবিধা অসুবিধা বা কি রকম? সাধারণ একস্তর বিশিষ্ট রকেট বিমান দ্বারা যদি কাজ না হয় তবে ঠিক করতে হবে এই দুই উপায়ের মধ্যে কোন্‌টাকে বেছে নেওয়া হবে। তর্কটাও হচ্ছে এরই উপর। এসবক্ষেত্রে সাধারণত যেমন ঘটে থাকে, উপগ্রহের সমর্থক যাঁরা তাঁরাও নিজেদের নির্ভুল বলে জাহির করলেন, আবার এঁদের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী যাঁরা অর্থাৎ রকেট ট্রেনের ধারণার সমর্থকরাও নিজেদের একই রকম নির্ভুল বলে জাহির করলেন। আবার কিছু সন্দেহবাদীও জুটে গেল যারা বলতে লাগল দুটোই ব্যর্থ হবে।

আমি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছি যে সেদিন যেমন আমি উপগ্রহের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম তেমনি আজও আমি তার পক্ষেই আছি। আমার বলে দেওয়া উচিত যে আমার এই দৃষ্টিভঙ্গীটা সুপরিজ্ঞাত প্রশ্নাতীত সব তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সারবত্তা দেখানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হলো বিরুদ্ধবাদীদের দুর্বলতাগুলি দেখিয়ে দেওয়া। বাস্তবিক পক্ষে বহুস্তর রকেট পদ্ধতির দ্বারা কি পাওয়া যাবে? এমনকি তরল রকেট-এঞ্জিনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট রাসায়নিক জ্বালানি ব্যবহারের যে ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা রয়েছে সে সবও আমরা ধরে নিচ্ছি। আমরা হিসেব করলে দেখতে পাব যে এই জ্বালানি দ্বারা গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে বেরিয়ে আসা গ্যাস-

গুলি সেকেণ্ডে ৫ কিলোমিটারের মত গতিবেগ পেয়ে যায়। (অর্থাৎ গ্যাসগুলি যখন প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বস্তুশূন্যতার মধ্যে বেরিয়ে আসে)।

প্রত্যেকটি গ্রহান্তর যাত্রায় জালানির পরিমাণ স্থির করার জন্য উপযুক্ত আদর্শ গতিবেগটাও জানা দরকার। চাঁদে উড়ে যাওয়ার জন্য বিমানের আদর্শ গতিবেগ সেকেণ্ডে ২৩ কিলো-মিটারের কম হলে চলবে না। 'চাঁদ—১' বিমানটির সম্পর্কে এই হিসাবই ধরা হয়েছে। আচ্ছা, একেবারে ঠিক্‌ঠিক্ ২৩ কিলোমিটারই বা কেন? কোথা থেকে এই হিসাবটা পেলাম তা দেখা যাক।

প্রত্যেকটি গ্রহান্তর যাত্রাতেই মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করা দরকার। এর জন্য লাগবে সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার গতিবেগ। বাতাসের প্রতিকূলতা এবং উড্ডয়ন আরম্ভের সময় আকর্ষণের শক্তিগুলির প্রতিক্রিয়ার ফলে গতিবেগের যে হ্রাস হবে তা সেকেণ্ডে এক কিলোমিটারের কম নয়, সবশুদ্ধ গতিবেগের হ্রাসটা ১·৫ কিলোমিটার ধরে নেওয়া যেতে পারে। চাঁদে অবতরণের সময় বিমানের গতি রুদ্ধ করার জন্য লাগবে সেকেণ্ডে ২·৯ কিলোমিটার, আর ফিরতি পথে চাঁদ থেকে ওড়া শুরু করার সময় দরকার হবে সেই একই গতিবেগ। গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে পথের দিকনির্দেশ সংশোধন করার জন্য এবং যাত্রাপথে কিছু বাড়তি মজুত হাতে রাখার জন্য আরো এক কিলোমিটারের কমে চলবে না। তাহলে এই ৩ সেকেণ্ডে ১৯ কিলোমিটার পাওয়া গেল।

এই কি সব ? না এখনও আছে।

এখন তাহলে পৃথিবীতে অবতরণটা হবে কেমন করে ? যদি বিমানের সমস্ত গতিবেগটা এঞ্জিনকেই সামলাতে হয় তা হলে তার জন্য এঞ্জিনের সেকেণ্ডে আরো ১২ কিলোমিটার গতিবেগ দরকার। তাহলে সাধারণ আদর্শ গতিবেগ দাঁড়াবে সেকেণ্ডে ৩১ কিলোমিটারের সমান। এই সংখ্যাটিকে কি কোন প্রকারে কমানো যায় না ? হ্যাঁ কমানো যায়, যদি বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতা দিয়ে বিমানের গতিরুদ্ধ করা যায়। সত্যি কথা এই যে এক্ষেত্রে গোড়া থেকেই এঞ্জিন কার্যরত থাকবে বিমানের গতিকে সেকেণ্ডে ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত কমিয়ে আনার জন্য। কাজে কাজেই ১২ যোগ না করে যোগ করব ৪। এইভাবেই পাওয়া গেল প্রয়োজনীয় আদর্শ গতিবেগ যা হল সেকেণ্ডে ২৩ কিলোমিটারের সমান।

এই রকম আদর্শ গতিবেগ সুনিশ্চিত করার জন্য কি পরিমাণ জালানির দরকার ? ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির সূত্রেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। এই সূত্র অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে যে ওড়া আরম্ভ করার সময় বিমানের মধ্যেকার জালানির ওজনকে বিমানের সাধারণ ওজনের শতকরা ৯৯ ভাগ করতে হবে। যদি বিমানে কোন রকম বাড়তি ভারবস্তু নাও থাকে, যদি শুধু বিমানের দেওয়াল, জালানি আর এঞ্জিনটাই থাকে তবুও এরকমের বিমান বানানো সম্ভব নয়। বিশেষ সুবিধাজনক ক্ষেত্রে জালানির শতকরা ৯০ ভাগ হতে পারে কিন্তু এরকম বিমান করাও সম্ভব নয়। সকলেই জানে যে অনেক

বড় বড় ভারবস্তু আমাদের নেওয়া দরকার। কার্যত এর ওজন হয়ে দাঁড়াবে ৫ টনের মত ;—যাত্রীসহ কেবিন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, জালানি ইত্যাদিরও ওজন দাঁড়াবে ঐ একই রকম।

চার স্তরের রকেট ট্রেনে কাজ কতটা সহজ হয় দেখা যাক। স্তরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে লাভ হয় কমই, অথচ ট্রেনের জটিলতা খুবই বেড়ে যায়। বাস্তবিক যে ফলাফলগুলি আমরা পেয়েছি তা খুবই জটিল, নিশ্চয়ই আমরা সেগুলি এখানে দেখাব। ট্রেনের প্রথম স্তরটার ওজন হওয়া চাই ৩৫০০ টন, যার মধ্যে ৩১৫০ টন হল জালানি আর ৩৫০ টন হল রকেটের নিজের ওজন। ওড়া আরম্ভ করার সময় যখন এই স্তরের সমস্ত জালানিটাই খরচ হয়ে যাবে তখন এটা ট্রেন থেকে স্বয়ংক্রিয়-ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীতে পড়ে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে দ্বিতীয় স্তরের এঞ্জিনটি কাজ শুরু করবে। এই স্তরটির ওজন হল ৭৫২ টন, মধ্যে ৬৭৭ টন হল জালানি।

সমস্ত জালানি খরচ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় স্তরটাও ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই মুহূর্ত থেকেই ট্রেনটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিবেগে উড়তে থাকবে। ছোট্ট হয়ে যাওয়া ট্রেনটা এইভাবে চাঁদের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। চার স্তরের বদলে তখন এটা হয়ে দাঁড়াবে ২১৮ টন ওজনের মাত্র দুই স্তরের রকেট ট্রেন।

চাঁদে অবতরণের সময় গতিরোধের জন্য তৃতীয় স্তরের সমস্ত জালানিটাই খরচ হয়ে যাবে। এই জালানির ওজন হবে

১৩৮ টন আর রকেটটার নিজের ওজন হবে ১৫ টন। তৃতীয় স্তরটা চতুর্থ স্তরটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদেই পড়ে থাকবে, ফিরতি যাত্রার সময় এর আর দরকার হবে না।

শেষটি অর্থাৎ চতুর্থ স্তরের রকেটটি চাঁদ থেকে উড়ে চলে আসবে। সাধারণভাবে এর ওজন হল ৬৫ টন, এর মধ্যে ৫০ টন হচ্ছে জালানির ওজন, ডানাশুদ্ধ রকেটটা হল ১০ টন, আর ৫ টন হল—সব জিনিসপত্র সহ যাত্রী কেবিনটা।

এই হিসেবের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে চাঁদে যাওয়ার জন্য এরকম চারস্তরের রকেট বিমান ব্যবহার করলে পৃথিবী থেকে ওড়া শুরু করার সময় তার ওজন হবে ৪৪৭০ টন। এরকম ওজনের এবং আয়তনের বিমান তৈরি করা সম্ভব বটে কিন্তু তা খুবই শক্ত এবং সমস্যার বিষয়।

এখন তাহলে নিজেরাই বিচার করে দেখ যে, চাঁদে উড়ে যাওয়া কতটা সহজ হয়ে পড়ত যদি পথের মধ্যে জালানি নিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকত। উড়োজাহাজ চলাচলের জন্য এ-রকম ব্যবস্থা তো বহু আগে থেকেই করা হচ্ছে। তাতে ওড়া আরম্ভ করার সময় জালানির পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলা যেত। আরো অনেক কমানো যেত উড়বার সময়কার বিমানের ওজন।

যত কমানো যেত তার পরিমাণটা হিসাব করা যাক। ধরে নেওয়া যাক, মহাকাশে জালানি ভরে নেওয়ার বহিঃ-স্টেশন হিসাবে পৃথিবীর এই উপগ্রহটি এরি মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। ৩৫৯০০ কিলোমিটার উচ্চতায় ২৪ ঘণ্টাওয়ালা

কক্ষপথে এটি পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে। তার মানে পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে এর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এই রকম উচ্চতায় উপগ্রহটির গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ৩·১ কিলোমিটার। এই উপগ্রহটিতে পৌঁছানোর জন্য যে বিমানটি পৃথিবী থেকে যাত্রা করবে যাত্রারম্ভের সময় তার আদর্শ গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২ কিলোমিটার হওয়া চাই। বিমানের ট্যাঙ্কের মধ্যেকার জ্বালানির সাহায্যে পাওয়া যাবে সেকেণ্ডে ১০ কিলোমিটার আর প্রয়োজনীয় গতিবেগের বাদবাকি অংশটা পাওয়া যাবে যাত্রারম্ভ করিয়ে দেওয়ার রকেটের সাহায্যে। বিমানটা যখন উপগ্রহটিতে গিয়ে পৌঁছুবে তখন তার ট্যাঙ্কগুলো প্রায় শূন্য হয়ে যাবে ; এগুলি আবার নতুন করে নিতে হবে, বিমানটাকে চাঁদ পর্যন্ত উড়ে যেতে হলে কতটা জ্বালানি নেওয়া দরকার তা হিসেব করে দেখা যাক। উপগ্রহটি এবং তার সঙ্গে নোঙর-করা বিমানটি এখন পৃথিবীর চতুর্দিকে সেকেণ্ডে ৩১ কিলোমিটার গতিতে পরিক্রমা করতে থাকবে। কিন্তু এরকম উচ্চতায় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতার গতিবেগ হল সেকেণ্ডে ৪·৪ কিলোমিটার। তাহলে চাঁদে উড়ে যাওয়ার জন্য বিমানটিকে এখন সেকেণ্ডে মাত্র ১·৩ কিলোমিটার গতিবেগ সৃষ্টি করলেই চলবে।

যাতে উপগ্রহটির গতিবেগকে সম্পূর্ণ রকমে কাজে লাগানো যায় এরকম সময় হিসাব করে বিমানটা চাঁদের দিকে রওনা দেবে। চাঁদের উপর পতন রোধ করবার জন্য দরকার হবে সেকেণ্ডে ২৯ কিলোমিটার গতিবেগের শক্তি। আবার

ওড়া আরম্ভ করার জন্যও দরকার হবে ঐ একই পরিমাণ গতিবেগের। ফিরতি পথে যাতে ঠিক সুবিধাজনক সময়টিতে উপগ্রহটিতে গিয়ে পৌঁছান যায় তার জন্য বাড়তি গতিবেগ সেকেণ্ডে ১·৩ কিলোমিটার কমিয়ে আনতে হবে। গতিবিধি সংশোধনের জন্য ৩ সেকেণ্ডে ১·৬ কিলোমিটার হাতে রাখা দরকার। সব মিলিয়ে তাহলে দাঁড়াল সেকেণ্ডে ১·৩+২·৯+১·৩+২·৯+১·৬=১০ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে ওড়া শুরু করার সময় যে গতিবেগ দরকার হয় এটা তার থেকে বেশি নয়।

উপগ্রহটিতে পৌঁছতেই সমস্ত জালানি খরচ হয়ে গেল বটে কিন্তু উপগ্রহটিকে আরেকবার কাজে লাগানোর কোন অসুবিধা হবে না। দ্বিতীয়বার এখানে জালানি ভরে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়বার জালানি ভরে নেওয়া দরকার হবে পৃথিবীতে অবতরণের জন্য। পৃথিবীতে অবতরণের জন্য অপেক্ষাকৃত কম জালানিরই দরকার হবে। উপগ্রহটি ছেড়ে আসার পর বিমানের গতিবেগ কমিয়ে দিতে হবে এবং তখন এটা পৃথিবীর উপর পড়তে শুরু করবে। এই সময়ে সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটারের কাছাকাছি গতিবেগ উৎপন্ন হবে। এই গতিবেগের একটা বড় অংশ কমাতে পারা যাবে বায়ুমণ্ডলের সহায়তায়।

এইভাবে সেকেণ্ডে ১০ কিলোমিটার আদর্শ গতিবেগের হিসাব ধরেই আমাদের ট্যাঙ্কগুলির ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারা যাবে। মনে রাখতে হবে ২৩-এর জায়গায় গতিবেগে মাত্র ১০-এ এসে দাঁড়াল।

এর মানে হল এই যে ৎসিওলকভ্স্কির সূত্র অনুযায়ী জালানির ওজন বিমানের মোট ওজনের শতকরা ৯৯ ভাগ না হয়ে হবে মাত্র শতকরা ৮৭ ভাগ। এতে বিমানটা কি রকম দাঁড়াবে দেখা যাক।

জালানির খালি ট্যাঙ্কগুলি সহ বিমানের ওজন হবে সবশুদ্ধ ২৮ টন। এর মধ্যে ৫ টন হল প্রয়োজনীয় ভারবস্তু। বিমানের মধ্যেকার জালানির পুরো ওজন হবে ১৮২ টনের মত। সুতরাং পৃথিবী থেকে ওড়া আরম্ভ করার সময় কিংবা উপগ্রহটি থেকে রওনা দেওয়ার সময় বিমানের মোট ওজন দাঁড়াবে ২১০ টনের মত। জটিল চারস্তরবিশিষ্ট বিমানের ৪৪৭০ টনের ওজনের জায়গায় এক স্তরবিশিষ্ট বিমানের ওজন হল মাত্র ২১০ টন! এই হল কৃত্রিম উপগ্রহের পদ্ধতি অনুসরণের ফল! এ হল তথ্য, এর উপরে তো আর লড়াই চলে না।

সত্যিকথা, উপগ্রহের বিরুদ্ধবাদীরা এর উপরে তর্ক তোলে না। তারা অন্য কথা বলে। তারা বলে, পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যে ও-রকম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। পৃথিবী থেকে ওটাকে সজ্জিত করে ওখানে উঠিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তারা বলে উপগ্রহে গিয়ে বিমানে জালানি ভরার ব্যাপারটা খুবই কঠিন। এসব কিছুই সত্য। কিন্তু এও সত্য যে এই সব সমস্যাগুলিও অতিক্রম করা যাবে। তাছাড়া, একদিন না একদিন এরকম উপগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবেই। সেদিন এক-একটা প্রকাণ্ড বহুস্তর রকেট বানানোর চেয়ে এই উপগ্রহই বহু উড্ডয়নের কাজে লাগবে।

উপগ্রহটির নিজের জ্বালানির বোঝাইয়ের কাজটি পৃথিবী থেকে তৈলবাহী রকেটের সাহায্যে করা হবে। কোনদিন হয়ত চাঁদ থেকেও একাজটা হতে পারে, যদি সেটা বেশি সুবিধার হয়। ডানা-লাগানো এই সমস্ত রকেটগুলিতে দুজন করে বিমানকর্মী থাকবে। উপগ্রহটির ট্যাঙ্কের মধ্যে জ্বালানিগুলো ফেলে দিলে রকেটগুলো পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

এর পর বৈজ্ঞানিক এবং নির্মাণবিদেরা এমন একটি আণবিক জেট-এঞ্জিন তৈরি করলেন যার ফলে বেরিয়ে-আসা গ্যাসের গতিবেগ হল ১০ কিলোমিটার। এই আণবিক জেট এঞ্জিনই এই তর্কের মীমাংসা করল। বেরিয়ে-আসা গ্যাসের ঐ রকম গতিবেগ হওয়ার ফলেই চাঁদে অভিযানের জন্য সরল একস্তর-বিশিষ্ট বিমান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই বিমানে উড্ডয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্বালানিরই স্থান সংকুলান করান গিয়েছে। এই বিমান আমরাই তৈরি করেছি—আর তা হল "চাঁদ-১"।

যদি আণবিক যন্ত্রবিদ্যা আমাদের সাহায্য না করত তবে চাঁদে অভিযান করা খুবই শক্ত হয়ে পড়ত।

অবশ্য প্রশ্ন করা যেতে পারে, আণবিক এঞ্জিন যখন হয়েই গেছে তখন আর এসব কথা কেন? হ্যাঁ, চাঁদে অভিযানের ব্যবস্থা করা গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু যদি আগামী কালই আমাদের উপর "মঙ্গল-১" এর পরিকল্পনার দায়িত্ব পড়ে, তখন কিন্তু আণবিক এঞ্জিন দিয়েই সম্পূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করতে

পারব না। সুতরাং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেই পুরানো তর্কে আমাদের ফিরে আসতেই হবে। যদি এর মধ্যে আণব বৈজ্ঞানিকরা আরো ভালো কিছু আবিষ্কার করতে পারেন, অর্থাৎ এমন কোন এঞ্জিন যার গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ২০ কিলোমিটার বা অন্তত পক্ষে ১৫ কিলোমিটার তবে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু পক্ককেশ বৃদ্ধেরা যে বলতেন, নিজেদের চেষ্টা থাকলে তবেই ভগবানের সাহায্য পাওয়া যায়—কথাটা ঠিকই। তা না হলে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাদের 'এল' নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মীই গোপনে আরো সুদূর গ্রহান্তর যাত্রার কথা খুব বেশি দিন চিন্তা করত না। তবেই দেখ…আমাদের পুরোনা বিতর্কটার বিষয় তাহলে মনে না রেখে উপায় কি? ঐ তর্কের ভেতর দিয়েই সমস্যার সমাধান বার করতে হবে।

অবশ্য আমি বুঝি যে গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে জালানি ভরে নেওয়ার জন্য বহিঃস্টেশনরূপী উপগ্রহ সৃষ্টি করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। কিন্তু তবু আমি বলব এটা তৈরি করা সম্ভব এবং এটা যাতে তৈরি হয় আমি তাই চাই।

মহাজাগতিক যাত্রায় মানুষ

ডাক্তার ত, আ, আকোপিয়ানের পাঠানো রিপোর্টাজ

২৬শে নভেম্বর, ৮টা ৩০ মিনিট, গ্রহান্তবর্তী মহাশূন্য

প্রিয় পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ! আপনারা আমাকে সবচেয়ে যা চিত্তাকর্ষক তাই বর্ণনা করতে বলেছেন। কিন্তু

সে সম্বন্ধে তো আমি আগেই বর্ণনা করেছি। আমি যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ হল পৃথিবী। তিন থেকে পাঁচ সহস্র কিলোমিটারের উচ্চতা থেকে যখন পৃথিবীর দিকে তাকানো যায় তখন দেখতে পাওয়া যায় একটা প্রকাণ্ড গোলক, অন্ধকার মহাসমুদ্র আর উজ্জ্বল তুষার, সমস্ত আকাশ জুড়ে রয়েছে। নীলাভ ধোঁয়া-ধোঁয়া বায়ুমণ্ডল কিন্তু এখন এই প্রকাণ্ড বস্তুপিণ্ডটি চাঁদের মতই হয়ে গেছে—তেমনি উজ্জ্বল একটা কাস্তের মত ঝুলে রয়েছে আমাদের পিছন দিকে। বাঁদিকে রয়েছে সূর্য। এই কাস্তের তুলনায় সেটা বেশ ছোট। সামনে রয়েছে চাঁদ, এখন সেটা বড় হয়ে গেছে। সেটা সূর্যের চেয়ে বড় কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে ছোটই রয়ে গেছে। পরিষ্কার হয়ে উঠছে সমুদ্রের কালো ছোপগুলি। আলো আঁধারির সীমানায় বেশ কষ্ট করে নজর করা যাচ্ছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো। আমরা এখন মাঝ পথে রয়েছি।

এঞ্জিন বহুক্ষণ বন্ধ। সব চুপচাপ। কোন সাড়া শব্দ নেই। গতিবেগ অনুভূত হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা প্রকাণ্ড গোলকের ঠিক মাঝখানে আটকে আছি। পৃথিবী সরে যাচ্ছে কিন্তু তা চোখে ধরা পড়ছে না। আমরা স্থাণুবৎ, আর উপরে, নিচে, সামনে, পিছনে চতুর্দিকে সব স্থির, তারাগুলিরও পরিবর্তন নেই। নক্ষত্রমণ্ডলী, নিস্তব্ধতা আর শূন্যতা,—লক্ষ কোটি কিলোমিটারের শূন্যতা, আর ঠিক তার মাঝখানে ছোট্ট একটা বিন্দু,—আমাদের কেবিন,—

যেখানে আমাদের প্রাণ করছে টিম্‌টিম। আমি আপনাদের এই কেবিনের বর্ণনা দিতে পারি, বলতে পারি সেই আশ্চর্য নির্মাণ-কাজটির সম্বন্ধে যা আমাদের প্রাণকে রক্ষা করে চলেছে এমন জায়গায় যেখানে প্রাণের কোন অস্তিত্বই নেই।

বাইরেই বায়ুহীন মহাশূন্য। বাতাসও নেই, চাপও নেই। সামান্য একটা চিড়,—উল্কাপিণ্ডের টুকরোর আঘাতের ফলে ছোট্ট একটা ফুটো হলেই হিস্‌হিস্ করে বাতাস বেরিয়ে যেতে থাকবে বাইরে, তাপমাত্রা পড়ে যাবে, নিশ্বাস নেওয়া যাবে না। এজন্য আমরা নিশ্ছিদ্রভাবে আটকানো পোশাক পড়ে বসে আছি। শুধু স্বচ্ছ শিরস্ত্রাণগুলি খুলে আমাদের পাশেই রাখা হয়েছে। যদি বিমানটা জখম হয় তবে যেন একবার হাত নাড়লেই এগুলি পরে ফেলা যায়।

বাইরে অফুরন্ত সূর্যরশ্মি, তার মধ্যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর আলট্রাভায়োলেট এবং রঞ্জনরশ্মিও আছে। কিন্তু কেবিনের ধাতব দেওয়ালগুলি আমাদের ভালভাবেই রক্ষা করছে। এই রশ্মিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি; এ রশ্মি অবশ্য আমাদের দেওয়াল ভেদ করে যেতে পারে। কিন্তু এই রশ্মির পরিমাণ সামান্যই। আয়নমণ্ডল দিয়ে উড়বার সময় দেখা গিয়েছে যে মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা ক্ষতি হবার কোন আশঙ্কা নেই।

বাইরের তাপমাত্রা কত? সঠিকভাবে বলতে গেলে, গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে কোনরকম তাপমাত্রাই নেই। কারণ তাপটা হল পদার্থের অণুগুলির নড়াচড়া মাত্র। বায়ুহীন মহাশূন্যে

তো অণুই নেই। কিন্তু বিমানের যে দিকটা সূর্যালোকিত সেটা লোহার ছাদের মতই তেতে লাল হয়ে যায়, উল্টোদিকটা যেটায় ছায়া থাকে, সেটাতে তাপমাত্রা ১০০° ডিগ্রীর নিচেই থাকে। যাতে কেবিনের মধ্যে অবস্থাটা ঠিক থাকে তার জন্যে নানা পদ্ধতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা দ্বারা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে। সূর্যালোকিত দিকটা দিয়ে ছায়ার দিকটা উত্তপ্ত হবে আবার ছায়ার দিকটা দিয়ে সূর্যালোকিত দিকটা ঠাণ্ডা থাকবে। কিন্তু আমরা এই জবরজং ব্যবস্থা বাতিল করেছি। কেবিনের নিশ্ছিদ্রভাবে আটকানো আস্তরণটার উপর একটা তাপ নিরোধক স্তর রয়েছে ; এটাই শীতাতপ থেকে আমাদের ঠিকভাবে রক্ষা করে। আর কেবিনের ভিতরে 'এয়ার কণ্ডিশনের' ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক উত্তাপ এবং বৈদ্যুতিক শৈত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে।

তাই আমাদের তাপমাত্রা স্বাভাবিক, আরামদায়ক। কিন্তু আমরা তো আর ঘরে বসে নেই, আমরা রয়েছি গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে। এই অভিযানে নির্লিপ্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে থাকাও অসম্ভব। ওড়া আরম্ভ করার সময়েই বাড়তি ভারের সমস্যাটা আমাদের টনক নড়িয়ে দিল। আমরা তখন বাড়তি ভার নিরোধক বাক্সের উপর শুয়ে পড়েছিলাম। তারপর যখন এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল তখন এই বাক্সগুলি সব ইজিচেয়ারে পরিণত হয়ে গেল। আর এখন বেশির ভাগ সময়েই আমরা এইসব ইজিচেয়ারে বসে

আছি। যখন ওজন অনুভব করা যাচ্ছে না তখন স্থির হয়ে বসে থাকাই ভাল।

ওজন-হীনতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আগেই আমাদের প্রচুর তালিম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীতে থাকতেই ওজনহীনতার মধ্যে আমাদের নূতন করে হাঁটা, হাত পা নাড়া শেখার দরকার হয়েছিল। কারণ এই অভ্যাসগুলি থাকলে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। ধরুন পা ফেলতে গেলেন—মাথাটা গিয়ে ঠুকে গেল ছাদের সঙ্গে। নাড়তে গেলেন হাত,—ঘুরে পড়লেন আরেক দিকে। প্রত্যেকটি নড়াচড়াতেই যাতে হাত-পা-মাথা ঠুকে না যায় সেজন্য কেবিনের ভিতরের দেওয়ালগুলিকে ছাদ থেকে একদম মেঝে পর্যন্ত খুব নরম একটা সংকোচনশীল পদার্থ দিয়ে মুড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু যতদূর সম্ভব আমরা যে যার ইজিচেয়ারেই বসে থাকব; কারণ কেবিনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো খুব সুবিধাজনক নয়। চতুর্দিকেই ঠাসাঠাসি; রসদে, যন্ত্রপাতিতে, পর্দায়, চাকায়, বাক্সে একেবারে বোঝাই। এর মধ্যে ঘুরে বেড়ানো মোটেই আরামদায়ক নয়। আমরা একটা দেওয়ালের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করব; এতে প্রচুর হাতল রয়েছে; এগুলো ধরে টানাটানি করতে হতে পারে।

কাজের পরে ও বিশ্রামের পরেও আমরা ইজিচেয়ারের সঙ্গেই বাঁধা হয়ে থাকব। ওজনহীনতার সময় মাঝখানে ঝুলতে ঝুলতে ঘুমোনও অবশ্য যায়; কিন্তু সেটা বিশেষ আরামদায়ক মোটেই হবে না। অভিযাত্রীদের খাদ্যের
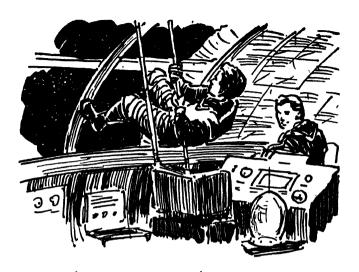
পরিমাণও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। প্রচুর পরিশ্রমের সময় ২৪ ঘণ্টায় মানুষের ৩৭০০ ক্যালোরি তাপ নির্গত হয়। খাদ্য দ্বারা এই পরিমাণ উত্তাপই পূরণ করা দরকার। এই হিসাব অনুযায়ী বৈমানিক ও ডুবুরীদের রেশন ধরা হয়ে থাকে। এই হিসাব ধরেই প্রচুর ক্যালোরি সম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্যাদি দিয়ে আমরা আমাদের খাদ্যতালিকা তৈরি করেছি। অভিযান চলবে ১৪ দিন ধরে। কিন্তু সব রকম অবস্থার উপযুক্ত পাঁচ সপ্তাহের খাদ্য আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সকালের, দুপুরের, আর রাত্রির খাওয়া পৃথিবীতে যেভাবে আমরা খাই উড়ন্ত রকেটের মধ্যকার খাওয়া তার থেকে আরামদায়ক! কেতলি কি করে গরম হবে? আমার মনে

পড়ছে ‘এল’ নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানে এ নিয়ে কত বাক্যব্যয় হয়েছে। মুস্কিল শুরু হল এই নিয়ে যে, তলার দিকে জল তো গরম হবে, কিন্তু উপরের দিকে রয়ে যাবে ঠাণ্ডাই। আকর্ষণহীনতার জন্য গরম জলও উপরে উঠে যাবে না আর ঠাণ্ডা জলটাও নিচে নেমে আসবে না। কেতলিটাকে ঝুঁকিয়ে ধরলে তার থেকে একটি ফোঁটাও জল বার করতে পারবে না। জল বাইরে আকর্ষিতই হবে না। যদি কেতলিটাকে ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দেওয়া যায় তবে নল দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ফোঁটা বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝুলতে থাকবে। সেটাকে যদি ঠোঁট দিয়ে ছোঁয়া যায় তবে তা মুখে লেগে লেপ্টে যাবে।

এই ওজনহীনতার কথা মনে রেখেই টেবিলটা সাজানো হয়েছে (যদি অবশ্য দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো ফোল্ডিং টেবিল আর তাকটাকে টেবিল বলা চলে)। টেবিল এবং তাকের উপরকার সমস্ত জিনিসই আটকানো। চায়ের কাপের বদলে আমাদের রয়েছে সরু-গলাওয়ালা বোতল; একটা কাঁচের পাইপের সাহায্যে তার ভিতরের জিনিস চুষে চুষে খেতে হবে। রবারের বল লাগানো স্প্রে করার যন্ত্রের মত দেখতে একটা যন্ত্র ব্যবহার করে আমরা তরল পদার্থকে এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে ঢালি। দরকার হলে চা কফি কিংবা কোকো বানাতে হবে বিশেষ ধরনের একটা ইলেকট্রিক চুল্লীর মধ্যে। যাতে তরল পদার্থটির বিভিন্ন স্তর পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যায় এবং সমানভাবে উত্তপ্ত হয় সেইজন্যে পাত্রটি ঘুরতে থাকবে। এর ফলে উৎকেন্দ্রিক

শক্তির সৃষ্টি হবে। এই শক্তিই আকর্ষণ-শক্তির বদলে কাজ করবে।

এমন কি, ধোয়া-কাচাও একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই ওজনহীন কেবিনের মধ্যে। যে অবস্থায় জলের প্রাথমিক ধর্ম যে প্রবহমানতা অর্থাৎ উপর দিকে থেকে নিচের দিকে বয়ে যাওয়ার গুণ সেটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সে অবস্থায় জলের কল, বাথরুম, ধারাস্নান, এ সমস্তই অচল। এই জন্যে আমরা ঠোঁটের সাহায্যেই ধুই। ঠোঁট তরলপদার্থটাকে ভিতরে টেনে নিতে পারে কারণ তার ভিতরে তখন অল্প বাতাসের একটা গহ্বর সৃষ্টি হয়ে যায়। আকর্ষণের শক্তির উপরে নির্ভর করে বাইরের বাতাসের চাপের উপর, ভেতরের বাতাসের চাপ নয়।

গ্রহান্তরগামী বিমানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াও এইরকমই একটা ঝামেলার ব্যাপার। আমরা আমাদের সঙ্গে বিশেষ-ধরনের পাত্রে নিম্নতাপে-রাখা তরল অক্সিজেন নিয়ে যাচ্ছি। তরল অক্সিজেনের আপেক্ষিক আয়তন কম। একজন লোককে পুরো ২৪ ঘণ্টা ধরে যোগান দেওয়ার জন্য এক লিটারই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষ তো শুধু নিশ্বাসই নেয় না, প্রশ্বাসও ছাড়ে। একটা বিশেষ ধরনের কনডেন্সারের সাহায্যে কেবিনের বাতাস অবিরাম পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার করার কাজটা হয়—৭৮ ডিগ্রীর ঠাণ্ডায়, যে ঠাণ্ডায় কার্বনিক এসিড জমাট বেঁধে যায়। জমাট বাঁধা কার্বনিক এসিড গ্যাসকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং অক্সিজেন মেশানো বাতাস আবার কেবিনের মধ্যে ফিরে আসে।

এইগুলি সবই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির দ্বারা হয়। ঝড় হয়ে যাওয়ার একটু পরেই জঙ্গলের বাতাস যেমন তাজা এবং সৌরভময় থাকে আমাদের এখানের বাতাসও তেমনি ; কারণ অক্সিজেনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে ওজোনও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ওজোনের একটা খুবই শক্তিশালী বীজাণুনাশক ক্ষমতা আছে। নিশ্ছিদ্ররূপে ঢাকা কেবিনের মধ্যে ওজোনটা বিশেষ প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয়।

এসব ছাড়াও কনডেন্‌সারটি মানবদেহ থেকে বাতাসের মধ্যে উবে-যাওয়া জলকণাগুলিকে সংগ্রহ করবে। এই জলকণাগুলি বাতাস এবং সল্টের সাহায্যে ঘনীভূত হলে পরে একজন মানুষের দৈনিক জলের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে মানুষ খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে যতটা জল গ্রহণ করে থাকে তার থেকেও বেশি জল নির্গত করে দেয়। এর কারণ, আমাদের দেহযন্ত্রের ভিতরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত কিছু পরিমাণ অক্সিজেন এবং পুষ্টিসাধনের উপাদানগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হাইড্রোজেন একত্রিত হয়ে জলের সৃষ্টি হয়। এইরকম ভাবে উৎপন্ন জলের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ গ্রাম হয়ে যায়। এইভাবে জলের খরচ কমানরও একটা সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমে আমরা জল পান করব, তারপর প্রশ্বাসের সঙ্গে জল বের করে দেব, তারপর আবার সেই জল সংগ্রহ করে যান্ত্রিক কায়দায় ব্যবহার করব।

এ সমস্ত ব্যাপারই থাকবে আমার হাতে। বাতাস, খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছন্নতা এসবের উপর নজর রাখতে হয়

আমাকেই। এছাড়া সাথীরা কেমন থাকে, তাদের স্বাস্থ্য, এসব সম্বন্ধেও আমাকেই যত্ন নিতে হয়। এইভাবে আমরা সবাই পর্যবেক্ষণকারীও বটে এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণের বস্তুও বটে। এই তো এখুনি আমার পর্যবেক্ষণের বস্তুগুলির মধ্যে একজন অস্থির হয়ে পড়েছেন এবং ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর মতে এখন প্রাতরাশের সময় হয়ে গেছে। কাজেই বন্ধুগণ, এখন আপনাদের কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে। ডাক্তার এবং রেডিও সংবাদদাতা থেকে এখন আমি হয়ে যাব প্রধান পাচক। প্রাতরাশের পর আমি আবার ডাক্তার বনব, তারপর ১২টা বেজে ৩০ মিনিটে হব রেডিও সংবাদদাতা।

বেতার এবং বৈদ্যুতিক সহকারীবৃন্দ

রেডিও টেলি-কন্ট্রোল ব্যবস্থা নির্মাতা

এ, ই, ভিনোগ্রাদফ্

'চাঁদ—১' বিমানটিতে মানুষ আছে চার জন। কিন্তু সেই মানুষ কটির বিশ্বস্ত সহকারী হিসাবে কাজ করছে অনেকে। এই সহকারী হল—স্বয়ংক্রিয় এবং স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত বেতার এবং বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি। এই যন্ত্রপাতিগুলির একটা সামান্য অংশই অবশ্য থাকবে বিমানের মধ্যে—যেগুলি সবচেয়ে হাল্কা এবং আয়তনে ছোট শুধু সেইগুলি।

অল্প কথায় প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি, কলকব্জার বর্ণনা করা

সম্ভব নয়, সুতরাং বিমানের মধ্যেকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতি যেগুলি শুধু সেগুলিই বর্ণনা করব।

সমস্ত যন্ত্রপাতির সেরা হল পরমাণবিক এঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালন যন্ত্রটি। এটা জানা কথা যে পরমাণবিক জালানির সামান্য হ্রাস বৃদ্ধিতেই পরমাণবিক প্রতিক্রিয়ার বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। যেই ইউরেনিয়ামের সামান্য একটু বৃদ্ধি হল, অমনি খুব তাড়াতাড়ি উপরের দিকে উঠতে থাকবে তাপমাত্রা, গ্যাসের গতিবেগও বাড়তে থাকবে, চার্টে লেখা হিসাব ছাড়িয়ে গিয়ে বিমানটা সোজা ছুটতে থাকবে সামনের দিকে এবং পথ হারিয়ে ফেলবে। এ ত তবু ভালো! তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পেলে দেওয়ালগুলো গলে যাবে, এঞ্জিনটা যাবে অচল হয়ে, আর বিমানটা পৃথিবী কিংবা সূর্যের একটা শাশ্বত গ্রহ কিংবা উপগ্রহে পরিণত হয়ে ভ্রমণ করতে থাকবে একেবারে নতুন একটা কক্ষপথে। এই রকম হলে বিমানের কর্মীদের উদ্ধার করে আনার কোন সম্ভাবনাই নেই। সবচেয়ে খারাপ হলো যদি এঞ্জিনের মধ্যে বিস্ফোরণ হয়ে বিমানটা সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।

পরমাণবিক এঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন একজন মানুষের উপর নির্ভর করা চলে না। কার্যধারা এত দ্রুত এবং এত বিভিন্ন ধরনের যে মানুষের চোখ দিয়ে সমস্ত কলকব্জার উপর নজর রাখাও যায় না, মানুষের শ্লথগতি হাত দিয়ে সময় মত হস্তক্ষেপও করা যায় না। এইজন্য একটা খুবই জটিল

স্বয়ংক্রিয় রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র দিয়ে বিমানের মধ্যে এঞ্জিনটিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

এঞ্জিন যখন কাজ করে তখন কাজে সামান্য এদিক ওদিক হলেই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল পরিমাপক যন্ত্রগুলিতে তা ধরা পড়ে। এই যন্ত্রগুলি রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায়। বিদ্যুৎপ্রবাহ আলোর গতিতেই ছড়িয়ে পড়ে, তাই রেগুলেটর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংকেতটা পেয়ে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক নির্দেশ উৎপন্ন করে ফেলে। নির্দেশগুলি তার দিয়ে গিয়ে মোটরের মধ্যে পৌঁছয়। এইগুলিই জল এবং জ্বালানির চাপ নিরোধক নিয়ন্ত্রণ ভাল্‌ব্‌-গুলিকে পরিচালিত করে। এই সমস্তই কিন্তু সংঘটিত হয় সেকেণ্ডের একাংশ মাত্র সময়ের মধ্যে এবং তাই বিদ্যুৎটা খুবই সময়মত নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় এবং এঞ্জিনটি সঠিকভাবেই নির্ধারিত কাজ করে যায়।

উড়ন্ত অবস্থায় বিমানের ভারসাম্য রক্ষার এবং ভার নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ধরনের খুবই জটিল এবং সক্রিয় কলকব্জা আছে। এই সমস্ত কলকব্জাগুলি কি রকম এবং কত জটিল তা ধারণা করবার জন্য এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দশ হাজারের মত ইলেকট্রনিক এবং ক্রিষ্ট্যাল ল্যাম্প (এগুলির আয়তন চালের দানার থেকে একটু বড়) এবং কয়েকশত কিলোমিটার বিভিন্ন রকমের কেব্‌ল্‌ এবং তার। এই প্রসঙ্গে আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে টেলিভিশনে সবশুদ্ধ মাত্র গোটা কুড়ি ল্যাম্প আছে।

কলকব্জাগুলির সবচেয়ে বড় কাজ হল সামগ্রিকভাবে সেগুলির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ। বিমানের মধ্যে হাতে চালানো একটা বাড়তি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও থাকবে। যদি পৃথিবীর এবং বিমানের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বিকাল হয়ে যায় তবে বিমানকর্মীরা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু এরকম হওয়াটা প্রায় অসম্ভব। কারণ বিমাণের মধ্যে থাকবে কলকব্জার দুটো সম্পূর্ণ সেট—একটা আরেকটার পরিপূরক। আর পৃথিবী থেকে কাজ করতে থাকবে আরো তিনপ্রস্থ কলকব্জা।

আমি আগেই বলেছি যে বিমানের মধ্যে শুধু সবচেয়ে হাল্কা এবং ছোট যন্ত্রপাতিগুলিই রয়েছে। বাকি যন্ত্রপাতি সবই পৃথিবীতে রয়েছে। আমরা পৃথিবী থেকেই উড্ডয়ন নিয়ন্ত্রণ করব। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিমানের উড্ডয়ন আরম্ভ হবে এবং মহাজাগতিক গতিবেগ অর্জিত হবে। মানুষের করার জন্য বাকি থাকবে মাত্র একটা কাজ—বিমান এবং বিমানকর্মীদের পরীক্ষা করে নেওয়া, এবং বোতাম টিপে বহুসংখ্যক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিকে নির্দেশ দিয়ে দেওয়া।

আমাদের আরো বাড়তি অসুবিধার সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর আবর্তন। বেতার তরঙ্গ তো ভূগোলক ভেদ করে যায় না, কাজেই রকেটটা যখন দিগন্ত অতিক্রম করে চলে যায় তখন আর আমরা এর উড্ডয়নকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। তাই ককেশাসের নিয়ন্ত্রণ স্টেশন ছাড়াও ভূগোলকের অপরদিকে, বেরিং সাগরের তীরে আমাদের আরো একটা মেশিন তৈরি

করতে হয়েছে। এই দুইটি মেশিনই পর্যায়ক্রমে মহাজাগতিক বিমানটিকে নিয়ন্ত্রিত করবে।

যাতে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে বিপদ না ঘটে সেজন্যে আমরা বিমানের মধ্যে একটা বিশেষ রাডার স্টেশন তৈরি করেছি। বিমানদেহের মধ্যে অবস্থিত এই রাডারটি আগে থেকেই বড় বড় উল্কাপিণ্ডগুলির এগিয়ে আসার এবং তাদের গতিবিধির ও গতিবেগের খবর দেবে। রাডারটি যদি সংঘর্ষের আশঙ্কা করে তবে স্বয়ংক্রিয় কলকব্জাগুলির বৈদ্যুতিক সঙ্কেত পাঠাবে। এই সঙ্কেত গিয়ে পৌঁছুবে ডানায় বসানো এঞ্জিনগুলিতে এবং তাতেই উড্ডয়নের দিক পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই সবকিছুই সংঘটিত হবে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে বিমানটির অবতরণের পর্যায়টি হল বিশেষ দায়িত্বের। বিমানের মধ্যে অবস্থিত একটা বিশেষ জটিল যন্ত্র কাজ করবে এই সময়ে। আমরা এর নাম দিয়েছি "চাঁদের উচ্চতা পরিমাপক।" এর সাহায্যে বিমান এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের মধ্যেকার দূরত্ব সর্বদা বুঝতে পারা যায়।

সোবিয়েতের চারজন মানুষ তাদের স্বদেশ থেকে শত সহস্র কিলোমিটার দূরে উড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে তাঁরা সঙ্গীহীন হবেন না। রেডিও তাঁদের পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করে রাখবে। বিমানের মধ্যে রেডিও টেলিফোন এবং বেতার প্রতিচ্ছবি প্রেরণের যন্ত্র বসানো থাকবে। একটা তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সিতে পৃথিবী থেকে বিমানের যন্ত্রে সঙ্কেত পাঠানো হবে আর আরেকটা তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সিতে বিমান

থেকে সঙ্কেত আসবে পৃথিবীর যন্ত্রে। এছাড়াও পরীক্ষাকারী ডাক্তারদের জন্যে বিশেষ একটা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। অভিযাত্রীরা কেমন থাকেন তা তাঁরা অবিরাম পর্যবেক্ষণ করে যাবেন এবং অভিযাত্রীদের বিশেষ ধরনের পোশাকের সঙ্গে লাগানো বিশেষ যন্ত্রপাতিগুলির মারফত তাদের স্বাস্থ্যের খবরাখবর পাবেন। অদৃশ্যপূর্ব কোন ঘটনা যদি অভিযাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটায় তবে ডাক্তারেরা সে সম্বন্ধে পরামর্শ করে বেতারযোগে তাঁদের নির্দেশ পাঠাতে পারবেন।

এছাড়াও বিমানের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র আছে। এটা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, চাপের স্থিরতা এবং বায়ুর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে। যন্ত্রপাতির মোটরগুলিরও 'স্বয়ংক্রিয়' নিয়ন্ত্রক আছে...কিন্তু এসব নিয়ে এখন নাই বললাম। এখন শুধু এটাই দেখা দরকার যে বেতার ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্র-ব্যবস্থা ঠিক মত করা হয়েছে কি না যাতে অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে যেন কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

সুদূর প্রাচ্যে

(কমসোমল্‌স্কাইয়া প্রাভ্‌দা পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়ন্ত্রণ স্টেশনের সম্বন্ধে একটি স্কেচ্)

দুশো বছর পরে যদি কখনো কোন স্কুলের ছাত্র প্রশ্ন করে, —কে পাঠিয়েছিল চাঁদে প্রথম রকেট, তাহলে মাষ্টার মশায় তাকে একটি ছোট্ট উত্তর দেবেন : "সমগ্র সোবিয়েত ইউনিয়ন।"

সমগ্র সোবিয়েত ইউনিয়নই মহাজাগতিক বিমানের স্রষ্টা। উরাল এবং জাপোরোজিয়ে এর জন্য দিয়েছে উচ্চগুণসম্পন্ন ইস্পাত, উত্তর উরাল দিয়েছে অ্যালুমিনিয়ম, কৌনবার্দ দিয়েছে তামা, আণবিক এঞ্জিনের জন্য ৪নং খনি দিয়েছে ইউরেনিয়াম। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, খারকভের বিজ্ঞান ইনষ্টিট্যুটগুলি নির্মাণ-কার্য এবং যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করেছে। আর যোগানদার কারখানাগুলির নাম তো একপৃষ্ঠায় লিখেই ওঠা যাবে না। যাত্রারম্ভের জন্য ককেশাস দিয়েছে তার গিরিশৃঙ্গ; এমনকি সুদূর চুকুৎকাও চন্দ্র অভিযানে অংশ নিয়েছে। আর এখানে এই বেরিং প্রণালীর তীরে সোবিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব-দিকের সীমায় তৈরি করতে হয়েছে দ্বিতীয় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক স্টেশন।

শীতে সমগ্র তুন্দ্রা অঞ্চল জনমানবশূন্য। ঝল্‌মলে সাদা রঙ ছাড়া সহস্র কিলোমিটারের মধ্যেও অন্য কিছুই চোখে পড়ে না। তারপর হঠাৎ কয়েকটা বাড়ি। মাকড়সার জালের মত রাস্তা। আর তার মাঝখানে একটা গম্বুজওয়ালা উঁচু বাড়ি। তার পাশেই একটা জটিল কারুকার্যময় কাঠামো, গ্রহান্তর বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার এরিয়াল। রাডার স্টেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এরিয়ালটি রয়েছে গম্বুজের নিচে; গম্বুজটা একে বাতাস এবং বরফের হাত থেকে রক্ষা করে।

প্রধান বাড়িটার মধ্যে ঢোকা যাক। সামনেই একটা উঁচু আলো-ঝলমল প্রকাণ্ড হল ঘর। দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো
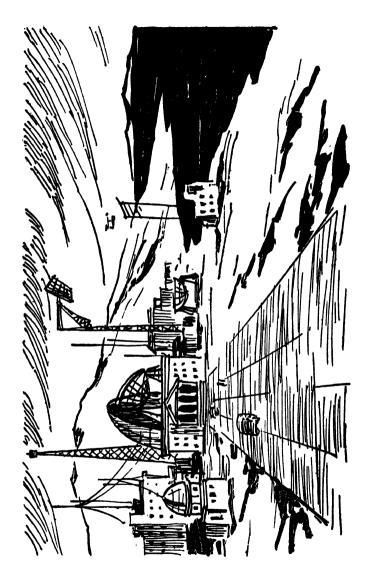
আছে একটা ধাতব তাক। অসংখ্য যন্ত্রপাতি কাজ করছে, সেগুলোর কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা, তা জানা যাচ্ছে শত শত মিট্‌মিটে রঙীন আলো বিন্দুর সাহায্যে। সবার আগে চোখে পড়ে একটা প্রকাণ্ড উজ্জ্বল স্বয়ংক্রিয় বোর্ড,—এটা উড্ডয়ন পথের নক্‌শা। এই কাঁচের দেওয়ালটার আয়তন হল ১০×১০ মিটার। একেবারে নিচের বাঁদিকের কোণে রয়েছে একটা উজ্জ্বল গোলক—এই হল আমাদের পৃথিবী। চাঁদের অবস্থান হল এর ওপরে ঠিক ডানদিকে। আয়তনে এটা একটা আপেলের থেকে বড় হবে না। বাড়তে-থাকা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত একটা সাদা রেখা এ-দুটোকে যুক্ত করতে চলেছে। এই রেখাটার শেষ মাথায় একেবারে চাঁদের খুব কাছাকাছি জ্বল্‌জ্বল করছে একটা লাল আলো। এটা রকেটের অবস্থান দেখিয়ে দিচ্ছে। বিমানটির পথ শেষ হতে এখোনা প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার বাকি।

এই দূরত্বটা সঠিকভাবে জানিয়ে দিচ্ছে প্রদর্শনী বোর্ডের ছয় অঙ্কের সংখ্যাটা মোটর গাড়ি কিংবা ইলেকট্রিক মিটারের মতই সংখ্যাগুলি অনবরত বদলে যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে রকেটটা এখন ৩৭৯·৪৭২ কিলোমিটার—না ৪৭৩ হয়ে গেছে ··· উঁহু, ৩৭৯·৪৭৪ কিলোমিটার, শেষ সংখ্যাটা মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই বদলে যাচ্ছে। রকেটটা এখন সেকেণ্ডে দুই কিলোমিটারের মত বেগে উড়ে চলেছে।

গম্বুজের নিচে প্রশস্ত হলঘরটার মধ্যে লোক আছে ছয়জন। প্রত্যেকেই নিজের নিজের যন্ত্রপাতিগুলির পর্যবেক্ষক।
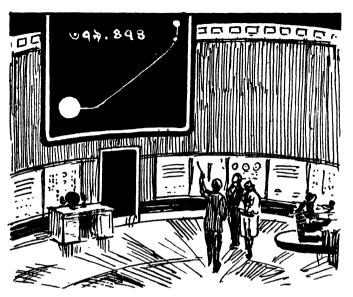
প্রদর্শনী বোর্ডটার কাছেই রয়েছেন স্টেশনের অধ্যক্ষ ইভান্ ইগ্‌নাতিয়েভিচ্ পেত্রভ্।

উনি বললেন—“আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, আমাদের স্টেশনের কি কাজ? কাজ একটাই—একেবারে অবতরণ করানো পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটাই বিমানটিকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে করতে হবে যাতে জালানির বাজে খরচ না হয়।

“যাতে যথাসম্ভব কম জালানি খরচ করা যায়, এজন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং এঞ্জিনীয়াররা আগেই রাস্তা এবং উড্ডয়নের চার্ট হিসাব করে ঠিক করে দিয়েছেন। এগুলো ঠিকভাবে বজায় রাখাই হল আমাদের কাজ। পরিচালনার

ভুল হলে তা সংশোধন করতে এঞ্জিন চালাতে হবে, তার মানেই জালানির বাড়তি খরচ।

"আমাদের স্টেশন আগে থেকেই এই বাজে খরচের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দেয়। বহু দূর পাল্লার পথের উড়োজাহাজগুলিতে জালানির বাজে খরচ হয়ই। এগুলি যদি স্বয়ংচালিত না হয়ে মানুষ-চালিতও হয়, তাহলেও জালানির শতকরা কয়েক ভাগ বাজে খরচ হয়ে যায়। মহাজাগতিক বিমানে খরচ আরো প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। যাত্রারম্ভের গতিবেগ যদি $\frac{১}{১০}$ শতাংশ মাত্র ভুল হয় তাহলেই বিমানটাকে এমন জায়গায় নিয়ে ফেলবে যেখান থেকে বিমানটাকে আরো ৪০ হাজার কিলোমিটার উড়তে হবে।

"ভুলটা যদি সময়মত ধরা পড়ে তবে সেটা সংশোধন করা কিছু মুস্কিলের নয়; কিন্তু সেটা যদি নজর এড়িয়ে যায় তবে পার্থক্যটা বেড়েই চলবে এবং পরে ঠিক পথ ধরে ফিরে এলেও তার উপযুক্ত জালানি থাকবে না।

"সময়মত ভুল ধরা এবং সেগুলি সংশোধন করা এই হল আমাদের কাজ।

"রাডারটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বয়ংক্রিয় এরিয়ালটা, যেটা গম্বুজের নীচে আছে, সেটা রকেটটিকে সর্বদাই নজরে রাখছে, কোথায় তার অবস্থান, কোনদিকে, কত দূরত্বে, ইত্যাদি। উজ্জ্বল প্রদর্শনী বোর্ডটির উপরের সংখ্যাগুলো হল এরই নির্দেশক। কিন্তু এই সংখ্যাগুলো তো শুধু দেখবার জন্যই। সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ঘটেছে এই হলের দেওয়ালের গায়ে বসানো বিশেষ ধরনের তাকগুলির মধ্যে। ওখানে রয়েছে ইলেকট্রনিক-হিসাব-যন্ত্র। রাডারের কাছ থেকে রকেটের অবস্থানের খবর পেয়ে যন্ত্রটা সেই খবর আগেকার হিসেব করে রাখা আদর্শ মহাশূন্য ভ্রমণ-পথটির সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখে নেয় এবং তার ফলে গতিবেগ এবং গতিনির্দেশের অবস্থায় ভুলের মাত্রাটা কত তা ধরা পড়ে যায়, তারপরে বিমানের এঞ্জিনের জন্য সঙ্কেতনির্দেশ সৃষ্টি হয়। যন্ত্রটা অসংখ্য ইলেকট্রনিক ল্যাম্প এবং কন্‌ডেন্‌সার ও ববিন্‌ দিয়ে তৈরি। শুধু এই একটা গাণিতিক যন্ত্রই একটা গোটা পরিকল্পনা-দপ্তরের কয়েকশো গণনাকারীর কাজ করতে পারে। ফসল-কাটা কলগুলো যেমন আসলে কাস্তের মতই কাজ করে তেমনি এই যন্ত্রটাও সাধারণ অঙ্ক-কষা কলের মতই।

"তাকের মধ্যকার কাজগুলো সবই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলে, আমরা শুধু এর ফলাফলই দেখতে পাই। প্রদর্শনী বোর্ডের উপরকার উজ্জ্বল সংখ্যাগুলোর আশেপাশে মধ্যে-মধ্যে আরেক রকমের সংখ্যা মুহূর্তের জন্য ভেসে ওঠে। এখন এগুলো নেই, তার মানে হলো রকেটটা এখন ঠিক মতই উড়ে চলেছে। পূর্বনির্দিষ্ট ভ্রমণপথ থেকে কোন বিচ্যুতিই বিমানটির ঘটেনি। কিন্তু ঐ ত ডানদিকে "+০·৭" লেখাটা দেখা গেল। এর মানে হল রকেটটা চার্টের থেকে ৭০০ মিটার ছাড়িয়ে চলে গেছে। ৭০০ মিটার খুবই সামান্য পরিমাণ; তাই এটা সংশোধনের জন্য এঞ্জিন চালিয়ে যাত্রীদের

অকারণ বিরক্ত করার দরকার নেই। ওরা এখন রয়েছে ওজনহীনতার জগতে, কিন্তু এঞ্জিন চালু হলেই ওরা আবার ওজনের জগতে ফিরে আসবে।

"ঐ যা! ভুলটা এক কিলোমিটারে পৌঁছে গিয়েছে! এখনই নিয়ন্ত্রণের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি এখান থেকে বেতার নির্দেশ পাঠাবে এবং বিমানের মধ্যেকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি এই নির্দেশ গ্রহণ করে এঞ্জিন চালু করে দেবে। ঐ দেখুন! সংখ্যাগুলি আবার কমে আসছে: ০·৯···০·৮···০·৭··· ব্যাস, আর কোন ভুল নেই। চার্টের সঙ্গে ঠিক মিলে গেছে।"

পেত্রভ্ আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে চললেন: "আমি নিজে উড্ডয়নের চার্ট এবং পথের উপর নজর রাখি; আর এই যে পাশের টেবিলে উনি হলেন ডাক্তার। আলাদা একটা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা মারফত আমাদের অভিযাত্রীরা কেমন আছে তার সমস্ত খবর উনি পাচ্ছেন। রেডিও এবং টেলিভিশনের আরো একটা যোগসূত্র আছে। টেলিভিশনের পর্দায় কেবিনটাকে এবং রকেটের সামনেকার তারা-ভর্তি আকাশ এবং নিকটবর্তী চাঁদকে আপনি দেখতে পাবেন। এই সব বেতার যন্ত্রপাতি, টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রেডিও-টেলি-প্রিন্টারের জন্য আলাদা একটা ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বহু সংখ্যক সংবাদদাতা রয়েছেন যাঁরা এ সবই যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই দুঃসাহসী যাত্রীদের উড্ডয়নের খবর সংগ্রহ করে সারা পৃথিবীময় প্রচার করছেন।

এঞ্জিনীয়াররা বিশেষ রেডিও-টেলিসেট্রিকাল যোগ-সূত্রের বন্দোবস্ত করেছেন। এই হলের শেষ মাথায় আপনি বিমানটির একটি উজ্জ্বল নক্শা দেখতে পাবেন। সমস্ত মোটর, যন্ত্রপাতি, যান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন-কি প্রায় প্রত্যেকটি ল্যাম্প পর্যন্ত তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ক্ষুদ্রতম ত্রুটি হলেই একটি লাল আলো জ্বলে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ কার্যরত এঞ্জিনীয়ার মহাকাশের মধ্যে তামারিনকে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দেন কোথায় সংশোধন করতে হবে। এইভাবে বিমানকর্মীদের কাজকে আমরা সহজ করে দিচ্ছি এবং এর ফলে তাঁরা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারছেন। এছাড়াও প্রয়োজন হলে আরো ভালো এঞ্জিনীয়াররা পরামর্শ দিয়ে তামারিনকে সাহায্য করতে পারেন।"

পেত্রভ যখন এ সমস্ত কথা বর্ণনা করছিলেন তখন মস্তবড় প্রদর্শনী বোর্ডটির উপরে লাল আলোর বিন্দুটা ধীরে ধীরে চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

দেখে মনে হচ্ছিল যেন এটা স্থির হয়েই রয়েছে, কিন্তু মিনিট তিনেক পরেই দেখা গেল যে সেটা সরে গিয়েছে। ঐ ত লাল আলোটা এরি মধ্যে সীমানাটা গিয়ে ছুঁয়েছে!

হঠাৎ বাধা পড়ল ঘণ্টায় একটানা শব্দে। কি ব্যাপার?

পেত্রভ বললেন—"আচ্ছা নমস্কার।" আলাপটা থামাতে হল। সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পর্যায় এখন আরম্ভ হচ্ছে—চাঁদে গিয়ে পৌঁছানো, গতিবেগ রুদ্ধ করা এবং অবতরণ।

তৃতীয় খণ্ড

চাঁদে

[আরো একটি টেলিগ্রাম—

যোগাযোগ দপ্তর সোবিয়েত ইউনিয়ন ফটো-টেলিগ্রাম	**সরকারী সংবাদ—**
চাঁদ ২৭...১২...১....৩	অবতরণ সুষ্ঠু হয়েছে। ১২টা—০০ মিনিটে "চাঁদ—১" 'বৃষ্টি-সাগরে' অবতরণ করেছে। প্রয়োজনীয় সবকিছুই ঠিক আছে। বিমান-কর্মীরা সুস্থ এবং প্রফুল্লচিত্ত। কর্মসূচী অনুযায়ীই অনুসন্ধান আরম্ভ করব।
ঠিকানা...মস্কো... সোবিয়েত মন্ত্রীদপ্তর সোবিয়েত ইউনিয়ন	"চাঁদ—১" বিমানের ক্যাপ্টেন: এম্. সিজফ্

চাঁদে এসে পড়েছি

ডাক্তার ত, আ, আকোপিয়ানের পাঠানো রিপোর্টাজ

২৭শে নভেম্বর, ১১টা-১২ মিনিট মস্কো সময়। "চাঁদ—১" বিমান থেকে।

চাঁদ এখন খুব কাছে—ঐ ত, আমাদের সামনেই! পৃথিবী হলে আমরা বলতাম "আমাদের উপরে," কিন্তু এখানে আমরা বহু আগে থেকেই "উপরে", "নিচে", "ডাইনে" "বাঁয়ে" ইত্যাদি ধারণাগুলো হারিয়ে ফেলেছি। এই ত এখন রেলিংএর হাতল ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমাদের রেডিও-অপারেটর এবং পাইলট আলিঅশা সোকোলফ্। পা দুটো তার লেগে রয়েছে উপরের দিকে। আর তারও নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে তার পা উপরে নয়, আমিই পা-দুটো উপরের দিকে দিয়ে রয়েছি।

সাধারণভাবে আমরা শুধু একটা দিকই বুঝতে পারছি, তা হল সামনে, আর ঐ সামনেই রয়েছে চাঁদ।

চাঁদটা বড় হয়েই চলেছে। প্রায় আধখানা আকাশ জুড়ে রয়েছে যেন একটা থালা। মাফ করবেন, ভুল হয়ে গেল, থালা এখানে কোথায়! সে তো পৃথিবীতে, চাঁদকে থালার মত দেখায় পৃথিবী থেকে ;—এখানে হল বলের মত, গোলগাল একেবারে ঠিক যেন একটি বল।

আশ্চর্য, এই উপগ্রহটিতে সব কিছু কত ভালভাবে দেখা যায়। অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কার। আমাদের সামনে যে ভূচিত্রটি দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে আমরা

মিলিয়ে নিচ্ছি সুন্দরভাবে তৈরি করা আমাদের চাঁদের ফটো ম্যাপটিকে। এটার মধ্যে সমস্ত কিছুরই নাম দেওয়া আছে। চাঁদের ভূচিত্রাবলীর সঙ্গে এরি মধ্যে আমরা পরিচিত হয়ে গেছি।

ঐ যে অন্ধকার ছোপটার একেবারে ধারে 'সঙ্কট-সাগর', বাঁ দিকে 'পরিষ্কার সাগর', আরো বাঁ দিকে 'ককেশাস' আর 'আপেনিস' পর্বতমালার পিছনে রয়েছে 'বৃষ্টি-সাগর'। এটা হল একট প্রশস্ত অন্ধকার সমতলভূমি। এই শুকনো "সমুদ্র"টাতেই আমাদের নামতে হবে।

হ্যাঁ, এ তো আর পৃথিবী নয়। এখানে সব কিছুই আলাদা। একটা রুক্ষ, বন্য, বিশৃঙ্খল নিসর্গ চিত্র। দৃশ্যমান অর্ধগোলকটির একটা বড় অংশই হল, ঘনসন্নিবদ্ধ পাহাড়ের শ্রেণী, সংখ্যাহীন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, কালো কালো গহ্বর আর গিরিখাত।

ছায়াগুলি ঘন কালো, দেখতে গহ্বরের মতই। আকাশ এখানে সম্পূর্ণ কালো। পৃথিবীতে কিন্তু এমন অন্ধকার হয় না। আলোকিত অংশটা একটু অদ্ভুত, দুই রংয়ে রাঙ্গানো, কেমন যেন অপার্থিব, মৃত। সম্ভবত এ সমস্ত কিছুরই একট বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে কিন্তু তা অত্যন্ত বিষণ্ন এবং বলা উচিত অস্বস্তিকর। যেখানে একফোঁটা জল নেই, বাতাস নেই, জীবিত কোন কিছুই নেই, সেখানে আনন্দদায়ক শান্তসমাহিত কিইবা থাকা সম্ভব!

যাই হোক এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যটা কিন্তু অস্বস্তিকর

অনুভূতির উদ্রেক করছে না। ব্যাপারটা কি তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। আমরা সবেগে চাঁদের উপর পড়ছি তো, আর চাঁদটাও তীব্রতর গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ; আমরা অস্বাভাবিক রকমের খাড়া হয়ে নেমে যাচ্ছি, আর দূরত্বটা কমে আসছে, তাতেই মনে হচ্ছে, বিপর্যয় এড়ানোর জন্য আমাদের যে গতিরোধ করার দরকার তাতে বুঝি আমরা দেরি করে ফেলেছি। অধ্যাপক এবং আলিঅশা যন্ত্রপাতিগুলির কাছ থেকে একটুও নড়ছেন না, কি যেন সব পরামর্শ করছেন। দেখা যাচ্ছে দুজনে দুজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন যাতে এই চরম দায়িত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে কোন ক্রমে ভুল না হয়ে যায়......সম্ভবত দুজনেই একটু উত্তেজিত রয়েছেন ..

চাঁদের দেহটা একটানা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মজার ব্যাপার হল, মহাশূন্যে আমাদের যে নিশ্চলতার অনুভূতি ছিল সেটা এখনো যায় নি। কিন্তু এটা যেন আরও পীড়াদায়ক। যে মুহূর্ত থেকে এঞ্জিনটা বন্ধ হয়েছে সেই মুহূর্ত থেকেই গতির অনুভূতি একেবারে চলে গেছে। আমাদের বিমানটা ঠিক যেন মহাশূন্যের মধ্যে থেমে রয়েছে। পৃথিবীটা ছোট হয়ে যাচ্ছে আর বাড়তে শুরু করেছে চাঁদটা। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে যখন এই সমস্ত দৃশ্যগুলি গা সওয়া হয়ে যাবে তখন মহাজাগতিক ভ্রমণটাও খুবই একঘেয়ে লাগবে, একটা জনমানবশূন্য নির্জন ছোট্ট স্টেশনে একটা রেলগাড়ির যেমন মনে হয় তার থেকে এটার পার্থক্য কিছুই মনে হবে না।

যাই হোক, শেষকালে...........

প্রধান এঞ্জিনটা কাজ করতে শুরু করেছে ; বিমানের পতনটা কমে আসছে ; কাঁপুনি অনুভব করা যাচ্ছে······

ওজনের অনুভূতি আবার ফিরে এসেছে! শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই আবার পায়ের উপর দাঁড়াতে পারব। হ্যাঁ, এখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিচের দিকেই নামছি। দূরের পাহাড়গুলি আস্তে আস্তে দিগন্তের পিছনে লুকিয়ে পড়ছে আর সামনেরগুলো বড় হয়ে উঠছে। আমাদের নিচে সব কিছুই যেন সমতল।

আলিঅশা সিনেমার ক্যামেরা ঘোরাচ্ছে।

ওহো! নামবার কাঠামোটার কাজ শুরু হয়ে গেছে। বিমান থেকে এখন তিনখানা পা বেরিয়ে পড়েছে। এই-পাগুলো ধাকাটাকে সামলাবে আর বিমানটাকে কাৎ হয়ে পড়তে দেবে না।

আর কয়েক সেকেণ্ড......তারপরেই নেমে পড়ব। আচ্ছা এখন তাহলে থামলাম।···

চাঁদ

(কিছু তথ্য)

চাঁদ হল পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ এবং আকাশচারী বস্তুপিণ্ডগুলির মধ্যে পৃথিবীর নিকটতম বস্তু। পৃথিবী এবং চাঁদের কেন্দ্রের মধ্যে গড়পড়তা দূরত্ব ৩৮৪০০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। এটা পৃথিবীর ব্যাসের ৩০ গুণ এবং মূল মধ্য-রেখা ধরে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণমেরুর ব্যবধানের ১৯ গুণ।

চাঁদের ব্যাস ৩৪৭৬ কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৪ ভাগের একভাগ এবং মস্কো থেকে তাশখন্দের দূরত্বের প্রায় সমান। চন্দ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার একত্র ক্ষেত্রফলের সমান ; কাজেই অনুসন্ধানকারী অভিযাত্রীদের পক্ষে যথেষ্টই বড়।

চাঁদের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ৫০ ভাগের একভাগ। এর ভর পৃথিবীর ভরের ৮১ ভাগের একভাগ। কাজেই চাঁদের ঘনত্ব পৃথিবীর গড়পড়তা ঘনত্বের চেয়ে কমই হবে। এটা মোটামুটি ভাবে ব্যাসল্টের ঘনত্বের সমান, কিন্তু পৃথিবীতে ব্যাসল্টের স্তরের নিচেই রয়েছে অত্যন্ত ঘন কেন্দ্র কিন্তু চাঁদে সম্ভবত কোন কেন্দ্র নেই।

আকাশচারী বস্তুপিণ্ডগুলির আকর্ষণশক্তি বৃদ্ধি পায় তাদের mass বা ভরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যাসার্ধের বর্গফলের হ্রাসের অনুপাতে হ্রাস পায়। চাঁদের mass বা ভর পৃথিবীর ভরের ৮১ ভাগের একভাগ এবং ব্যাসার্ধের বর্গফল ১৩ ভাগের এক ভাগ। ৮১কে ১৩ দিয়ে ভাগ করে ভগ্নাংশ সহ পাওয়া গেল ৬। কাজেই চাঁদে সব কিছুরই ওজন পৃথিবীর ওজনের ৬ ভাগের একভাগ হবে। অভিযানে অংশগ্রহণকারী-দের ওখানে ওজন দাড়াবে এটা ছোট্ট শিশুর ওজনের মত— ১০ থেকে ১৫ কিলোগ্রাম। কিন্তু তাদের মাংসপেশীর শক্তি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতই থাকবে। যদিও এঁদের মধ্যে কেউই বিখ্যাত খেলোয়াড় নন তবু এঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের তিনজন সঙ্গীকে একসঙ্গে ঘাড়ে করতে পারবেন।

পৃথিবীর চতুর্দিকে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করতে চাঁদের লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১২ সেকেণ্ড এবং নিজের মেরুদণ্ডের উপরও একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করতে এর ঐ একই সময় লাগে। এই জন্য সব সময়ই চাঁদের শুধু একটা দিকই আমাদের দিকে ফেরানো থাকে। আমরা সময় সময় উল্টো পিঠের সীমানার অঞ্চলটাই শুধু দেখতে পাই, কিন্তু যতদিন না চলচ্চিত্রগ্রাহক যন্ত্রপাতি সহ স্বয়ংচালিত রকেট চাঁদের চতুর্দিকে পাঠানো সফল হয়েছে ততদিন পর্যন্ত চাঁদের শতকরা ৪০ ভাগ জায়গা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল রহস্যময়। তারপর জানা গেল যে চাঁদের অদৃশ্য অংশটা তার দৃশ্যমান অংশ থেকে খুব একটা আলাদা কিছু না।

চাঁদের থালাটার মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে তার ঝল্‌মলে জায়গা আর অন্ধকার ছোপ্‌গুলি। ঝল্‌মলে জায়গাটা হলো স্থল আর অন্ধকারগুলো হল সমুদ্র। এই দুইয়ে মিলেই গড়ে উঠেছে চাঁদের মুখখানা। এর ডানদিকের 'চোখটার' নাম হল 'বৃষ্টি-সাগর' আর বাঁদিকেরটা হল 'পরিষ্কার-সাগর।' মুখটা হল 'মেঘ-সাগর'। এসব নামগুলি দেওয়া হয়েছে নিতান্তই চলতি নাম হিসাবে। তা না হলে, চাঁদে না আছে বৃষ্টি, না না আছে সমুদ্র, না আছে জল কিংবা বাষ্পের কোন চিহ্ন। চাঁদে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত নেই, 'থাকলেও খুব পাতলা, পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের মত।

প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রগুলো হল চ্যাপ্টা সমতলভূমি। এগুলোর পাড়ে মাঝে মাঝে আছে পৃথিবীর মত পাহাড়। চাঁদের

পর্বতমালা উঁচু এবং খাড়া। এমন পর্বতশৃঙ্গও আছে যা সমতল ভূমি থেকে ৮ কিলোমিটারেরও বেশি উঁচু। চাঁদের স্থলভাগ এবড়োখেবড়ো। সমগ্র স্থলভাগ জুড়ে রয়েছে চক্রাকার পাহাড়, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আর গোলাকার সমতল ক্ষেত্র। এই সব পাহাড়গুলির চক্রাকার প্রাচীরে সমতলভূমিগুলি ঘেরা রয়েছে। এখানে এমন সব গোলাকার সমতল ক্ষেত্র আছে যার মধ্যে ইউরোপের যে কোন একটা ছোটখাট দেশ, এই যেমন, বেলজিয়াম কি হল্যাণ্ডের জায়গা হতে পারে।

সমুদ্র, পর্বতমালা এবং আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ছাড়াও চাঁদে খাড়ি কিংবা ফাটল, ঢিবি, গহ্বর এবং জ্বালামুখের থেকে বেরিয়ে আসা উজ্জ্বল রশ্মিও দেখতে পাওয়া যায়। এই সব রশ্মিগুলির অন্যতম টাইকো জ্বালামুখের (বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টাইকোব্রাহির সম্মানে এর এই নামকরণ করা হয়েছে) থেকে বেরিয়ে আসা রশ্মিটা ২০০০ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছোয়। বড় দূরবীক্ষণ দিয়ে চাঁদের মধ্যে কয়েক কুড়ি কিলোমিটার মাপের এবং বেশ কয়েক মিটার উচ্চতা সম্পন্ন জিনিসগুলিকে স্পষ্ট করে চেনা যায়।

কয়েক শতাব্দী ধরে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চাঁদে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাননি। চাঁদ হল একটি মৃত জগৎ। সেখানে জলও নেই, বাতাসও নেই, পাহাড়গুলিও ক্ষয় হয় না, আবহাওয়ারও পরিবর্তন হয় না। চাঁদের মধ্যে যৎসামান্য পরিবর্তন যা ঘটে,

তার বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেন। চাঁদের দিন শুরু হওয়ার সময় প্লাতোন্ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মধ্যে যে সবুজাভ আলো দেখা যায় সেটার কারণ সম্বন্ধে তাঁরা এখনও নিশ্চিত হননি।

আগেই বলা হয়েছে চাঁদের একটি দিন পৃথিবীর প্রায় ১৪ দিনের সমান। রাত্রিও তাই। দু সপ্তাহ ধরে দিবাভাগে চন্দ্রপৃষ্ঠের উত্তাপ ওঠে +১২০ ডিগ্রী পর্যন্ত। আর রাত্রিকালে এর ঠাণ্ডা নামে —১৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত। কিন্তু মাটির মতই চাঁদেরও তাপ পরিবহন ক্ষমতা খুব কম হওয়ায় সামান্য একটু গভীরতার মধ্যেই অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রার একটা অঞ্চল বর্তমান থাকা সম্ভব। অভিযাত্রীরা এই সম্ভাবনাটা পরীক্ষা করে দেখবেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব সামান্যই আলো প্রতিফলিত হয়—শতকরা মাত্র ৭ ভাগ। এর অর্থ হল, সেখানকার মাটির রং খুব গাঢ়। কি "সমুদ্রে" কি "স্থলে" চাঁদের মাটির রং হল বাদামি। অনেকে মনে করে এখানকার মাটি খুব পাতলা ধূলো দিয়ে তৈরি। পাহাড় এবং ঢিবিগুলির যে ছায়া পড়ে তা কয়লার মত ঘোর কালো। চাঁদে আবছা আলো নেই। অন্ধকারের মধ্যে যদি কোন পথিক থাকে তবে তাকে তো দেখা যাবেই না, সে নিজেও কিছুই দেখতে পাবে না, যদি ধারে কাছে আলোকিত কোন খাড়া পাহাড় না থাকে।

এইবার চাঁদের আকাশ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কি দিনে, কি রাতে, এমন কি উজ্জ্বল সূর্যের আলোতেও আকাশ

সেখানে নিকষ কালো থাকে এবং তারাগুলোও দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর চেয়েও সেখানে ওগুলো বেশি পরিস্ফুট দেখায় এবং মোটেই মিট্‌মিট্‌ করে না। এও হয় আবছা আলো না থাকার জন্যই। চাঁদের একটি গোলার্ধ থেকেই পৃথিবীকে দেখা যায়। আমাদের এখানকার আকাশে চাঁদকে যত বড় দেখা যায়, সেখান থেকে পৃথিবীকে দেখা যায় তার ১৪ গুণ বড়। পৃথিবীকে প্রায় নিশ্চল দেখা যায় এবং তারাগুলি তারই পিছনে সরে যাচ্ছে দেখা যায়।

কেন আমরা চাঁদে যাচ্ছি

গ্রহান্তর সমিতির সভাপতি **ভ, ন, খোমেঙ্কো**

বিজ্ঞানের ইতিহাসের সেই মহান দিনটি এল। সম্পূর্ণ হল চাঁদে প্রথম অভিযান। শুরু হল জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গৌরবময় যুগ, মানুষের ইতিহাসের মহাজাগতিক যুগ।

সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকদের চাঁদে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই এই যুগের শুরু হল। মানুষের আবির্ভাব হয়েছে সহস্র সহস্র বৎসর আগে, চাঁদও ততদিন ধরেই রাত্রির অন্ধকারে মানুষকে আলো দিয়ে এসেছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে মানুষ চাঁদের সাহায্যেই গণনা করেছে সময়, প্রাচীন যুগের বর্ষপঞ্জীও ছিল চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আজও পর্যন্ত প্রাচ্য-দেশের বহু নরনারীর বর্ষপঞ্জীতে চান্দ্রমাসের হিসাবই করা হয়। আমরা সাধারণত যে মাসের হিসাব করি তা চান্দ্রমাস থেকে আলাদা হলেও আগের মতই চাঁদের সম্মানে এখনো

চান্দ্রমাসের কথা বলা হয়। প্রাচীন মানুষেরা চাঁদকে দেবী মনে করে তাকে পুজো করত এবং তার প্রতি বলি, নৈবেদ্য উৎসর্গ করত। মধ্যযুগের ভুয়ো পণ্ডিত জ্যোতিষীরা বলে বেড়াতেন যে আমরা যেসব আঘাত পাই এবং আমাদের যে চুরি-ডাকাতি হয় চাঁদই সে-সব কিছুর নিয়ন্তা। সপ্তাহের প্রথম দিনটির উপর এবং রৌপ্যের উপর তার প্রভাব। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ দিয়ে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করে সেখানে পাহাড় দেখতে পেয়েছিলেন। তিন শতাব্দী ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন এবং তার পাহাড় এবং সমুদ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করেছেন। আনুমানিক সিদ্ধান্তের যুগ এবার শেষ হল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা চাঁদের মাটিতে পা দেবেন, হাতের মুঠোয় তুলে নেবেন চাঁদের ধূলো।

প্রথম অভিযানের যাত্রীরা বেশিক্ষণ চাঁদে ঘোরাঘুরি না করেও যত বেশি সম্ভব সবকিছু দেখে শুনে নেবেন। এইজন্যেই প্লাতোন আগ্নেয়গিরির দক্ষিণে 'বৃষ্টিসাগরের' মধ্যে অবতরণের জায়গা স্থির করা হয়েছে (চাঁদের মুখখানার ডান ভুরুর নিচে)। এখানে খুবই কাছাকাছির মধ্যে স্থলভাগ, পর্বতমালা, চাঁদের "আল্প্স্" এবং "ককেশাস", শঙ্কু আকৃতি পাহাড় "পিকো" এবং চক্রাকার প্রাচীর সমন্বিত জ্বালামুখ রয়েছে। চাঁদে যে সমুদ্র, স্থলভাগ এবং বিভিন্ন রকমের পাহাড় রয়েছে তার একটা থেকে আরেকটার পার্থক্য কী তা আমরা জানতে পারব। অবতরণের জায়গাটা থেকে "আরিস্তার্ক"

জ্বালামুখটাও খুব বেশি দূরে হবে না। পূর্ণিমার দিনে এটা কেন যে এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেটি জানতে আমাদের সকলেরই আগ্রহ। এ ছাড়া প্লাতোন জ্বালামুখটাই তো একটা বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। সেখানে প্রতিদিনই রংয়ের পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। এটা কি আলোকিত হয়ে ওঠার জন্যই হয়, না কোন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে এ রকম হয়? না কোন সক্রিয় গহ্বরের আবির্ভাবের ফলে এরকম হয় (এটাই আমরা বেশি করে জানতে চাই)? বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ের উপর বহু বছর ধরে তর্কবিতর্ক করেছেন। এতদিনে আমরা এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাব।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌রা প্রশ্নের একটা লম্বা তালিকা তৈরি করেছেন। বাস্তবিক চন্দ্রপৃষ্ঠ কি ধূলো দিয়ে ঢাকা? এটা তো অভিযাত্রীরা অবতরণের এক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখতে পাবে। এই ধূলোর স্তরটা কি খুব বেশি পুরু? এর নিচে তাপমাত্রা কত? ওখানকার পাহাড়গুলি কি শ্রেণীর? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার জন্য অভিযাত্রীরা তিনটি জায়গায় খনন করবে; "সমুদ্রে", "স্থলে" এবং জ্বালামুখের মধ্যে।

এই কঠিন চন্দ্র-অভিযানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে খেলোয়াড়ি গৌরব অর্জনের জন্য নয়, শুধু কৌতূহলের বশেও নয়। এ অভিযানের উদ্দেশ্য—চাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করা। সে পরিচয় সঙ্গে সঙ্গেই হোক বা বছরখানেকের মধ্যেই হোক তা খুবই লাভজনক হবে।

সবার আগে আমরা পর্যালোচনা করব চাঁদের শিলাসমূহ।

আগেই আমাদের জানা ছিল যে চাঁদের সমস্ত শিলা পৃথিবীর শিলার মত একই রাসায়নিক পদার্থ সমূহ দ্বারা গঠিত।

সুতরাং চাঁদেও প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া খুবই সম্ভব। অবশ্য যে সব খনিজ দ্রব্য পৃথিবীতে সচরাচর মেলে না এবং যা দামি এবং ৪০০,০০০ কিলোমিটার বয়ে আনার উপযুক্ত, সেই রকম দুর্লভ মৌলিক পদার্থ, দামি ধাতু এবং বহুমূল্য মণিমাণিক্য সংগ্রহ করাই আমাদের আগ্রহ।

পৃথিবীর মত চাঁদও একই রকমের পরমাণু দ্বারা গঠিত। কিন্তু চাঁদের পরমাণুগুলি অন্যরকমের অবস্থায় রয়েছে—এখানে আকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত কম, এখানে বাতাস নেই, অক্সিজেন নেই, অক্সিজেন-মিশ্রণও হয় না, জল নেই, তার উপর আবার তাপমাত্রা খুব বেশিরকম ওঠানামা করে। তাই চাঁদে এমন খনিজ পাওয়া সম্ভব যার সঙ্গে পৃথিবীর খনিজের সাদৃশ্য নেই। এখানে নতুন রকমের যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করা যাবে বলে আমরা আশা করি। এসব পদার্থ কী কাজে লাগবে? এদের গুণগুলি পর্যালোচনা করার পর তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

এ সব গবেষণার কাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নয়, সেলেনোলজিষ্ট এবং সেলেনোগ্রাফিষ্টদের কাজ, তাই চাঁদের সম্বন্ধে এখন তাদেরই বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। (কথাদুটো এসেছে চাঁদের গ্রীক পরিভাষা সেলেনে থেকে—মানে হল চাঁদের ভূতত্ত্ববিদ্ এবং চাঁদের ভূগোলবিদ্) কিন্তু এই অভিযানের ফলাফলের জন্যই তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন।

বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করতেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চান। বায়ুমণ্ডল হল এঁদের প্রধান বাধা। বায়ুমণ্ডলের জন্যে গ্রহগুলির দৃশ্যরূপ বিকৃত হয়ে যায়, আলোক রশ্মিগুলি ছড়িয়ে যায়, ঘুরে যায়, এমন কি বায়ুমণ্ডলের জন্য পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্য ভেদ করে আলোকরশ্মি আসতেও বাধা পায়। আর, কালো মেঘে আকাশ ঢেকে থাকলে কতদিন ও কত ঘণ্টা ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ যে নষ্ট হয়, তাও এই বায়ুমণ্ডলের জন্যই। চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকায় এসব বাধা বিপত্তিও নেই। তাই বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণের কাজ করার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটা বিস্তৃত পরিকল্পনার খসড়া করে রেখেছেন। এই পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত হতে অবশ্য বহু বৎসর লাগবে। এই জন্যই প্রথম সোবিয়েত অভিযাত্রীদের একটি বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে চাঁদে একটি স্থায়ী কার্যরত জ্যোতির্বিজ্ঞানিক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা তা নিরূপণ করা।

চাঁদে যদি এরকম একটা মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে তা শুধু যে মহাকাশচারী বস্তুপিণ্ডগুলির কাজেই লাগবে তা নয়, পৃথিবীরও কাজে লাগবে। পৃথিবীর চেয়েও চাঁদ থেকে অনেক ভালোভাবে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতন স্তরটি পর্যালোচনা করা যাবে; কারণ পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ঘন এবং পুরু বাতাসের মধ্যে দিয়ে, আর অন্যদিকে চাঁদ থেকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে। পৃথিবীর একটি গোলার্ধের সমস্তটাই

একই সঙ্গে চাঁদ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। এইজন্যেই ওখান থেকে একই সময় একটা বিস্তৃত ভূভাগের উপর, বিশেষত মেরু সন্নিহিত অঞ্চলে এবং মহাসাগরবক্ষ প্রভৃতি জনহীন অঞ্চলে মেঘের চলাচল, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি অনেক ভালোভাবে পর্যালোচনা করা যাবে। ব্যাপারটা আশ্চর্য মনে হয় বটে কিন্তু আসলে আমাদের হাতে চাঁদের যে ম্যাপ আছে তা আফ্রিকার মরুভূমিগুলির এবং কুমেরু মহাদেশের ম্যাপের চেয়েও অনেক বেশি বিশদ

এবং সঠিক। আমরা চাঁদে পৌঁছুলে ফটোগ্রাফের সাহায্যে সমস্ত স্বল্পাবিষ্কৃত অঞ্চলগুলির ম্যাপ এঁকে ফেলা যাবে।

চাঁদে মানমন্দির হলে সেটি টেলিভিশনের ব্যাপক প্রচারেও বিশেষ সহায়তা করবে। চাঁদের মাত্র একটা রিলে স্টেশন দিয়েই, পৃথিবীর যে গোলার্ধের উপরে চাঁদ দেখা যায় সেই গোলার্ধের সমস্তটাতে টেলিভিশন প্রেরণ ব্যবস্থা হতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানেরও বিরাট লাভ হবে। পদার্থবিজ্ঞানীরা পৃথিবী ছাড়াও আরো দুটি স্বাভাবিক বীক্ষণাগার পাবে। প্রথমটি হল চাঁদ, অন্যটি হল গ্রহান্তরবর্তী মহাশূন্য। চাঁদের সূর্যালোকিত দিকটাতে রয়েছে আলট্রাভায়োলেট, রঞ্জন এবং অন্যান্য রশ্মির অফুরন্ত প্রবাহ। এই সব রশ্মির অনেকগুলিই বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। পৃথিবীতে বীক্ষণাগারে ছাড়া এই সব রশ্মি নিয়ে গবেষণা করা যায় না। চাঁদের অন্ধকার দিকের তাপমাত্রা অত্যন্ত নিম্ন যা পৃথিবীতে সহ্য করা বহু কষ্টসাধ্য এবং জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থা সাপেক্ষ। এখানে চতুর্দিকের অবস্থা আশ্চর্য রকমের তনূকৃত ; এক ঘন সেন্টিমিটারের মধ্যে কয়েকটি মাত্র পরমাণু থাকে ; সর্বশ্রেষ্ঠ রেডিও ল্যাম্পের থেকেও এটা সহস্র লক্ষ লক্ষ ভাগ কম। অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা, আকস্মিকভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়ে নিম্নতম থেকে উচ্চতম হয়ে যাওয়া, বস্তুর চূড়ান্ত তনূকরণ প্রভৃতি সম্পর্কিত সমস্ত রকমের পরীক্ষাই গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে হতে পারে।

এই সমস্ত পরীক্ষা সবে মাত্র আরম্ভ করা হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি হয়েছে আয়নমণ্ডল দিয়ে উড্ডয়নের সময় এবং আয়নমণ্ডলের সীমানার বাইরে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা। কিন্তু যন্ত্রপাতির কাজের একটা ত্রুটি আছে। নির্দিষ্ট কাজটি যন্ত্র খুব ভালভাবে করে বটে, কিন্তু সেই কাজটির বেশি কাজ সে যন্ত্র আর করতে পারে না। নতুন বিষয় জানতে হলে নতুন যন্ত্রপাতি বানিয়ে আরেকটা উপগ্রহ পাঠাতে হবে। আমাদের মনে ক্রমাগত নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হতে থাকবে—যেই আমরা একটা নতুন প্রশ্নের উত্তর পাব অমনি আরেকটা প্রশ্নের উদ্ভব হবে। এই ভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে তার উত্তর অনুসন্ধান করা এবং সিদ্ধান্ত টানতে পারা এবং আবার নতুন প্রশ্ন উত্থাপনও করা—এ কাজ করতে পারে বৈজ্ঞানিকই, এইরকম অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিকের কাজ যন্ত্র দ্বারা হতে পারে না। এই জন্যই শুধু যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে থাকা চলে না এবং চাঁদে এবং গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে জীবন্ত পর্যবেক্ষক পাঠাতে বাধ্য হতে হয়।

গ্রহান্তর্বর্তী বীক্ষণাগার সম্বন্ধে রাসায়নিক এবং জীব-বিজ্ঞানীদেরও আগ্রহ একই রকম। আকর্ষণহীনতার জগতে এবং চাঁদে যেখানে আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণের ছ' ভাগের এক ভাগ সেখানে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রাণ-পদ্ধতি কেমন ভাবে চলতে পারে তা জানা খুবই দরকার। জীব-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা খুব বড় আবিষ্কার আশা করি না।

অবশ্য কয়েকজন বিজ্ঞানী আশা করেন যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না এমন কিছু জীবাণু (যাকে বলা হয়ে থাকে অ্যানঅ্যারোবিক্) তা চাঁদের মাটিতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এইরকম জীবাণু যদি ওখানে পাওয়া নাও যায় তবু এটা খুবই সম্ভব যে ঐরকমের কোনো পৃথিবীর জীবাণু চাঁদে গেলে সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। এই সব পরীক্ষা চালাবেন অভিযাত্রী চিকিৎসক। চাঁদে গিয়ে মানুষ কি রকম অনুভব করে তাও তাঁকে জানতে হবে। সম্ভবত পরিশ্রান্ত মানুষের পক্ষে আকর্ষণহ্রাসের অবস্থাটা মঙ্গলজনকই হবে।

এই প্রবন্ধে অনেক অনুমানের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত মাসখানেকের মধ্যেই এই অনুমানগুলির কোনটা ভুল তা প্রমাণিত হয়ে যাবে আর অন্যগুলি সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে। আমি আগেই বলেছি যে অনুমানের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুগ শেষ হয়ে গেল, চাঁদ সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তর যুগ আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য যতটা আশা করা গিয়েছিল হয়ত ঠিক ততটা হবে না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্য একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক একজন লেখক—সে একজন মাত্র লোককে জেনেই উপন্যাস লিখছে। কিন্তু তার সমস্ত প্রতিভা, কঠিন পরিশ্রম এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ সত্বেও তার বর্ণনা এবং সিদ্ধান্ত আকস্মিক, অস্বাভাবিক এবং বেঠিকও হয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত এই কাল্পনিক লেখকটির অবস্থাতেই

রয়ে গেছে। আমরা জীবনের কথা বলেছি শুধু পৃথিবীর মধ্যকার জীবনের ইতিহাসকে জেনেই। শিলা সৃষ্টির কথা বলেছি পৃথিবীতে কেমন করে শিলা সৃষ্টি হয় শুধু সেটুকু জেনেই। এখনো পর্যন্ত শুধু পৃথিবী নামক গ্রহটির জগৎটাই কেমন ভাবে চলছে তাই আমরা জেনেছি। এখন আমরা আরো একটা জগতের সম্বন্ধে জানতে পারব—সেটা হল চাঁদ। এবং যদিও এ জগৎটি আমাদের জগতের মত নয়, যদিও এ জগৎটি খুবই বিরক্তিকর, একঘেয়ে, বিবর্ণ, তবু এ জগৎ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকে বহু দূর প্রসারিত করে দেবে—দ্বিগুণের চেয়ে বেশি, বোধ হয় ৫ থেকে ১০ গুণ প্রসারিত করবে। তাতে আমাদের লাভ হবে প্রচুর। এরপর থেকে, সোবিয়েত আবিষ্কারকরা যন্ত্রপাতি, পরিকল্পনা বা অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করার সময় চাঁদের থেকে পাওয়া তথ্যগুলির ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁরা হয়ত বলবেন, "চাঁদে এই খনিজটির চেহারা এই রকম। এই রকম বস্তুই পৃথিবীতে কেমন করে প্রস্তুত করা যাবে তা এখন বোঝা গেল।" হয়ত বলবেন, "গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ার ফলে এই রকম ঘটেছে; আচ্ছা, যদি আমরা এই রকমের রশ্মি-প্রবাহ সৃষ্টি করি তবে আমরাও অনুরূপ ফল পাব।"

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে প্রসারিত হলে তার ফলে মানুষের অভিজ্ঞতা যাবে বেড়ে। আর এটাই আমাদের অভিযানের প্রধান তাৎপর্য। আমরা চাঁদে যাচ্ছি যাতে পৃথিবীরই ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা,

জীববিদ্যার ক্রমোন্নতি হতে পারে। আরো তলিয়ে দেখতে গেলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে "আমরা চাঁদে যাচ্ছি ভূপৃষ্ঠের জীবনকে আরো ভাল করতে।"

চাঁদে প্রথম একটি ঘণ্টা

ডাক্তার **ভ, আ, আকোপিয়ানের** পাঠানো রিপোর্টাজ

২৭শে নভেম্বর, ১২টা বেজে ৫৫ মিনিট।

আমরা চাঁদে এসে পড়েছি! বন্ধুগণ, আমরা চাঁদে এসে পড়েছি! অবতরণ শুরু হয়েছে। সবই সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল আছে।

মৃদু হলেও খুব জোর একটা ধাক্কা নিচে লেজের দিকে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্কোচনশীল গদি আর শক্ত বেল্টের বাঁধনের জন্যে আঘাত থেকে আমরা বেঁচে গেলাম।

রকেটটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ল—বোঝা গেল যে একটা পায়া গর্তের মধ্যে পড়ে আটকে গেছে। এঞ্জিন বন্ধ হল।

আমরা চাঁদে নেমে পড়েছি। এখুনি আমরা বাইরে বেরুব।

মিখাইল আন্দ্রেভিচ্ সিজফ্ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য যাচ্ছেন। আমাদের দলপতি হিসাবে চাঁদে প্রথম পদার্পণের গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। উনি আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করলেন, তারপর শ্লুইস্ মঞ্চের খাঁচাটার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে একমিনিট দুমিনিট করে সময় কেটে যাচ্ছে। জানালায় কপালটা ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছি। ঐ

যে বন্ধ করা মঞ্চের বাইরের দরজাটা খুলে গেল, নিচের দিকে পড়ল একটা প্লাস্টিকের মই, দরজার মধ্যে দেখা গেল একজোড়া জুতো, পা, তারপর গোটা শরীরটা।

আমাদের ক্যাপ্টেন মইয়ের ধাপগুলো ধরে ধরে সন্তর্পণে নিচে নামছেন। বন্ধ-করা মঞ্চটা ২৫ মিটার উঁচুতে। পৃথিবীর দৃষ্টি-ভঙ্গিটাই এখনো আমাদের সকলের মধ্যে রয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এটা খুবই উঁচু, পড়লেই একেবারে পতন। কিন্তু চাঁদে এরকম পতন বিশেষ বিপদজনক হবে না; পৃথিবীতে দোতলা থেকে লাফ মারলে যা হয় তার থেকে গুরুতর কিছু না।

যাক্, অধ্যাপক 'মাটিতে'

নামলেন...আমার একটু ভুল হল,...উনি এখন রয়েছেন চন্দ্রপৃষ্ঠের উপরে। অধ্যাপক সামনে ঝুঁকে পড়ছেন··· দস্তানার তেলোতে জড়ো করছেন চাঁদের ধূলো, দেখছেন ধূলোগুলোকে। এই চাঁদের ধূলো কি জিনিস? ৩৮০০০০ কিলোমিটার দূর থেকে দেখে কত বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছেন, এর সম্পর্কে কত অনুমান করেছেন! অধ্যাপক তাঁর বিশেষ পোশাকের পকেটের মধ্যে নমুনাগুলো ঢেলে রাখলেন, তারপর আমাদের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন: "বেরিয়ে আসতে পার"। আমরা অর্থাৎ আমি আর আলিঅশা— দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি চাঁদে নেমে পড়লুম। ইউরি নিকোলায়েভিচ্ তামারিন এখন বিমানের মধ্যেই থাকবেন।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম—চারিদিকেই খাড়া পাহাড়, এলোমেলো ভাঙা-চোরা পাথর, আঁকাবাঁকা ফাটলযুক্ত এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমি—ধূলো আর পাথরের রাজত্ব, বিমর্ষ বিষণ্ণ এক মৃতের জগৎ। ফাটলের কালো গভীরতার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলুম। যদি ওখানে জল পাওয়া যেত! তাহলে চাঁদে ভ্রমণকে কত সহজ করে দিত! জল কি বের হবে না?

ওদিকে সিজফ্ আমাদের ডাকছেন সামনে—পাহাড়ের দিকে, চাঁদের পার্বত্য অঞ্চলে। ফুটবল খেলার মত করে লাফ দিয়ে ছুটলুম। একেকটা লাফে আমরা দশ মিটার করে পেরিয়ে গেলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবচেয়ে কাছের পাহাড়টিতে ওঠা কষ্টকর মনে হল।

আমাদের চোখের সামনে প্রসারিত হয়ে রয়েছে চাঁদের ছোট্ট দিগন্তটা। চতুর্দিকে দেখতে পেলুম, অন্ধকার ছায়া দিয়ে আঁকা সুস্পষ্ট পাহাড়ের শ্রেণী। কেমন করে আপনাদের কাছে বর্ণনা করি চাঁদের এই বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী! মনে করুন শুধু কালো ভুষোকালি দিয়ে আঁকা একটা ছবি। চক্‌চকে খাড়া পাহাড় আর কালো ফাটল, চোখ ধাঁধানো আলো আর কালির ছোপ্। কোন কিছুই আবছা নয়, আধো অন্ধকার নয়, কিন্তু দূরত্ব বুঝতে গোলমাল হয়ে যায়, সামনের পাহাড়টার সঙ্গে দূরের পর্বতটার কোনই তফাৎ বোঝা যায় না। দেখতে পেলুম সমতলভূমির উপর চারিদিকে কালো কালো গর্ত—সারি সারি গর্ত রয়েছে একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত। এই গর্তগুলি কিসের? এতো আমাদেরই পায়ের ছাপ—চাঁদে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন।

কেটে যাবে সহস্র বৎসর, কবরের নিচে হয়ত বিস্মৃত হয়ে যাব আমরা, কিন্তু আমাদেরই পদচিহ্ন টিকে থাকবে 'বৃষ্টি-সাগরের' বুকে। এই অদ্ভুত "সাগর" যার মধ্যে না আছে জল, না আছে বাতাস, না আছে ঢেউ, না আছে স্রোত, তার মধ্যে শতাব্দীর প্রতিটি ধূলিকণা পড়ে থাকবে নিশ্চল হয়ে চাঁদের অনন্তকালব্যাপী মুক্ত আকাশের নিচে।

আমার সহকর্মীরা এরি মধ্যে কাজে লেগে গিয়েছেন। আলিঅশা পর্যবেক্ষণ শেষ করে একধারে সিনেমার ক্যামেরা বসিয়ে ফেলেছেন। মিখাইল আন্দ্রিয়েভিচ্ সিজফ্ থলের মধ্যে চাঁদের শিলার নমুনা সংগ্রহ করছেন। তারপর ওঁরা

একটা সমতল পাথরের উপর ম্যাপ খুলে ধরলেন। উত্তর দিক কোনটা? যে তারাটা চাঁদের আকাশে ধ্রুবতারার কাজ করে থাকে অধ্যাপক সেইটা দেখিয়ে দিলেন। আলিঅশা একটা সাধারণ কম্পাসের দিকে তাকালেন। কাঁটাটা কোন দিকে রয়েছে? এই ত প্রথম আবিষ্কার হয়ে গেল! চাঁদেরও চৌম্বক মেরু আছে। চাঁদের এই চৌম্বক মেরুটা কোথায় রয়েছে? উত্তর দিকের সঙ্গে কি এটার মিল আছে? আলি-অশা তফাৎটা সযত্নে মাপতে আরম্ভ করলেন। আরেকটি নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জন্ম হল এখন থেকে—চাঁদের চৌম্বক তত্ত্ব।

এখনো পর্যন্ত যে জগৎ কারো প্রয়োজনে লাগেনি সেই মৃতের জগতে এসেছি সোবিয়েত দেশের বার্তাবহ, আমরা। আমরা এই জগৎকে দেখছি। এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, এর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছি...। এখন থেকে চাঁদের জীবনে আরম্ভ হল নতুন যুগ—মানুষের যুগ।

একবিংশ শতাব্দীর চাঁদ

বহুমুখী অভিযানের অধ্যক্ষ, ভূগোলবিদ্যায় ডক্টরেট প্রাপ্ত

ন, ক, এলনিকফ্

মাত্র গতকাল মহাজাগতিক বিমান ছেড়ে গিয়েছে পৃথিবী, আর আজই গ্রহান্তর স্টেশনের কারখানায় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে নতুন কাজ। যোগানদার কারখানাগুলো থেকে এসে পৌঁছুচ্ছে পরবর্তী রকেট "চাঁদ-২" এর অংশগুলি। আমরা জোড়াতাড়ার কাজে লেগে গিয়েছি।

প্রথম যাত্রা তো প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ মাত্র। এখন চলেছে আরো বড় বহুমুখী অভিযানের প্রস্তুতি। তিনটি রকেটে করে যাত্রা করবে ১১ জন লোক। চাঁদে পাঠানো হবে দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, একজন পদার্থ-বিজ্ঞানী, একজন ডাক্তার, দুজন এঞ্জিনীয়ার এবং আমাদের চন্দ্র পর্যবেক্ষণকারী দলে ৫ জন—ভূতত্ত্ববিদ্ এবং ম্যাপ অঙ্কনবিদ্।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কর্মসূচী করা হয়েছে দশ বৎসর হিসাব করে। চাঁদের মানমন্দিরে তাঁরা নতুন করে সমস্ত আকাশ পর্যালোচনা করবেন। আর ঐ দশ বৎসরের হিসাবেই আমরাও করব—চন্দ্রপৃষ্ঠের এবং চাঁদের শিলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কাজ।

কাজ কম নয় মোটেই। চন্দ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ৩৮ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর দিকে ফেরানো চাঁদের দৃশ্যমান অংশটির ম্যাপ বহু আগেই আঁকা হয়ে গেছে। এই ম্যাপটাকে শুধু আরেকবার মিলিয়ে দেখে নেওয়া দরকার; প্রধানত "সমুদ্র" পৃষ্ঠ এবং পাহাড়গুলোর উচ্চতাই সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে হবে। পৃথিবীতে আমরা উচ্চতার পরিমাপ করি "সমুদ্র" পৃষ্ঠ থেকে। চাঁদে সমুদ্র নেই, কাজেই অন্য কোন একটা প্রাথমিক সমতল খুঁজে নিতে হবে। চাঁদের উল্টো পিঠটায় কিন্তু আমাদের প্রচুর কাজ আছে। গোটা চাঁদের শতকরা ৪০ ভাগ হল এর ক্ষেত্রফল, একত্রে সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার সমান একটা অঞ্চলের ম্যাপ আঁকতে হবে।

ভূতত্ত্ববিদদের কাজটা হবে আরো চিত্তাকর্ষক। আমাদের

হাতে এসে পড়েছে একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ। সম্ভবত এখানে শুধু নতুন স্তরই যে আবিষ্কৃত হবে তা নয়, নতুন রকমের খনিজ দ্রব্যও আবিষ্কৃত হবে। চাঁদে তো সব কিছুই নতুন, এমন কি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার পদ্ধতিও নতুন করে উদ্ভাবন করতে হবে।

পৃথিবীতে আমরা কিসের থেকে সমীক্ষণ আরম্ভ করি? ধর, আমরা কোন একটা অজানা অঞ্চলে গিয়ে পড়লুম। সবার আগে খুঁজে বার করব একটা খোলা জায়গা, নদী নালার খাড়া পাড়। তারপর চেষ্টা করব ফসিল বা জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়ার; এই যেমন কোন মৃত প্রাণীর খোলা কিংবা হাড় ইত্যাদি। তারপর বিচার করে স্থির করব। ধরা যাক, সামনে পড়ল ব্র্যাকিওপোড। আমরা জানি ব্র্যাকিওপোডরা বেঁচে ছিল পাথুরে কয়লার যুগে। তাহলে এখানে কয়লা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

কিন্তু চাঁদে তো প্রাণীই ছিল না কোনদিন, খোলা আসবে কোথা থেকে? না ছিল জল, না বাতাস, না পাললিক শিলা। আমাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে এখানে বিচার করা চলবে না। এখানকার পর্যবেক্ষণের কোন নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করা দরকার।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে শিলার বয়স স্থির করা যায়। আমাদের এখন কাজ হল মোটামুটিভাবে জানা কোনটা বেশি প্রাচীন—চাঁদের মহাদেশটা না সমুদ্রটা? কখন আবির্ভূত হয়েছিল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলি, কখন আবির্ভূত হয়েছিল আলোগুলি আর কখনই বা চাঁদটি তৈরি

হয়েছিল? পৃথিবীর সঙ্গে একই সঙ্গে, না পরে? পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় জানতে হলে এটা জানা খুবই দরকার।

চাঁদ এখন মৃত। একটা জমাট কঠিন জগৎ। কিন্তু চাঁদের জন্ম আর আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলোর জন্ম এক সঙ্গে নয়। চাঁদের জন্মের পর কোন একদিন অগ্ন্যুৎপাত, কম্পন, পরিবর্তন, ভাঙ্গাগড়া প্রভৃতি ওখানে ঘটেছিল। কখন এসব ঘটেছিল, চাঁদের খনিজ পদার্থগুলো তৈরি হয়েছিল কখন এসব আমাদের জানতেই হবে।

চাঁদের চৌম্বকত্ব এবং চাঁদের অভ্যন্তরের গঠন কৌশল সম্বন্ধে জানতে আমাদের খুব আগ্রহ। চাঁদে আকর্ষণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত কম, এইজন্যে খুব গভীর খাদে অনেক দূর পর্যন্ত নেমে যাওয়া যায়। পৃথিবীতে দশ কিলো-মিটার বেশি গভীর খাদের মধ্যে নামার কথা খননকারীরা ভাবতেই পারে না। চাঁদে আমরা ৩০ থেকে ৪০ কিলো-মিটারের গভীরতা পর্যন্ত নেমে পড়ার আশা করতে পারি। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে ছোট, কাজেই এরকম খাদের সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় ১৫০ কিলোমিটারের খাদের তুলনা করা যেতে পারে। গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদে তাপমাত্রার পরিবর্তন কি রকম হয় সেটাও খুব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। চাঁদে কি কোন কেন্দ্র আছে? এটা জানবার জন্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে এবং চাঁদের অভ্যন্তরে কম্পনগুলো কিভাবে যায় তা লক্ষ্য করতে হবে। চন্দ্রপৃষ্ঠের নিচে শিলাস্তরগুলি কোথায় আছে তা জানবার জন্য চাঁদের আকর্ষণকেও আমাদের মাপতে হবে।

পৃথিবীতে আকর্ষণ শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি দেখেই বোঝা যায় পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন গভীরতার শিলাস্তরগুলি কতটা নরম বা কতটা ঘন হবে।

এসব পর্যালোচনা করার দরকার কেন? দরকারটা এই জন্যই যে এর দ্বারা ভূতত্ত্বের ক্রমোন্নতি হবে, চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে পৃথিবীরই খনিজ-তত্ত্ব, আগ্নেয়গিরি-তত্ত্ব, চৌম্বকতত্ত্ব লাভবান হতে পারে। তাছাড়া এসব পর্যালোচনার সর্বপ্রথম কারণ হল এই যে এর দ্বারা চাঁদের আভ্যন্তরীন গঠনকে জানা যাবে এবং খনিজগুলি কোথায় খোঁজা দরকার তাও বোঝা যাবে। তাহলে আর বিস্তীর্ণ চন্দ্রপৃষ্ঠে অন্ধের মত ঘুরে বেড়াতে হবে না। আর এত বড় একটা জায়গায় প্রত্যেকটি মিটার তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখাও অসম্ভব।

চাঁদে গিয়ে কিরকমের খনিজ পদার্থ খুঁজতে হবে, সেখানে কিরকম দামি বা নতুন বা অভূতপূর্ব খনিজ আছে বা সেগুলো কি কাজে লাগবে তার কিছুই আমরা এখনো জানি না। সে যাই হোক, চাঁদে গিয়ে প্রথম দিনেই আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করব জল। আমরা অবশ্য নিছক তৃষ্ণা মেটানোর জন্যেই জল খুঁজতে চাই না। আমাদের তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থা পৃথিবী থেকেই করে দেওয়া হবে। গ্রহান্তরগামী বিমানের জন্য জালানি হিসাবেই আমাদের জলের দরকার হবে। আপনাদের মনে আছে বোধহয় চন্দ্রে যাত্রা করা এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য "চাঁদ—১" কাজবেক থেকে ৪০০ টন জল নিয়ে গিয়েছিল। যদি আমরা চাঁদে জল ভরে নিতে পারতাম

তাহলে এই ভারি বোঝাটা যথেষ্ট কমে যেতে পারত। পৃথিবী থেকে আমাদের ১৫০ টন জল নিলেই যথেষ্ট হত, আর চাঁদে গিয়ে খালি ট্যাঙ্কগুলিতে ৮০ কি ৮৫ টন জল ভরে নিলেও চলত। গ্রহান্তরগামী বিমানের ওজন তাহলে অর্ধেক কমে যেত। সুদূরগামী যাত্রীবাহী উড়োজাহাজগুলির মতই এগুলো হয়ে পড়ত। এগুলোর আকারও ক্ষুদ্র হত, উড্ডয়নও সহজ হত। আর চাঁদে জল ভরে নিতে পারলেই আমরা ধীরে ধীরে মঙ্গলে এবং শুক্রে রকেট পাঠাতে পারতাম। চাঁদে যদি খনিজ বরফ পাওয়া যায় তাও ভাল কিন্তু স্ফটিকীকৃত জল আবিষ্কার না করা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে আমরা সঠিক কিছু বলতে পারছি না। যাই হোক পৃথিবীতে কিন্তু সর্বত্রই স্ফটিকীকৃত জল দেখতে

পাই। স্ফটিকীকৃত সল্ট, কাদা, অভ্র, গ্র্যানাইট ইত্যাদি বহু পাথরের মধ্যে এমন কি উষ্ণতম জলহীন মরুভূমির মধ্যেও স্ফটিকীকৃত জল থেকে যায়।

যদি আমরা জল খুঁজে না পাই তবে অন্য এমন একটা জিনিস খুঁজতে হবে যেটা তরল রকেট এঞ্জিনের জালানি এবং আণবিক এঞ্জিনের সক্রিয় বস্তু হিসাবে কাজ করতে পারবে। কোন ধাতব যৌগিক পদার্থ বা হাইড্রোজেন সিলিকেট, বা নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ হলেই চলে। অমিশ্রিত অক্সিজেন চাঁদে অবশ্য নেই কিন্তু সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা এবং ম্যাগনেসিয়ামের অক্সাইড পাওয়া খুবই সম্ভব। এই সমস্যাটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে চাঁদে কি জিনিস পাওয়া যাবে এটা পরিষ্কার হলেই গ্রহান্তরগামী বিমানের এঞ্জিনের ধরন পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে স্থির করা যাবে।

অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়টি নির্ধারণ করার কাজই আমাদের করতে হবে কিন্তু প্রত্যেকটি আবিষ্কার থেকেই আমরা পাব নতুন নতুন মতামত ও উদ্ভাবন এবং গবেষণার নতুন বিষয় এবং নতুন অভিযানের সম্ভাবনা। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর চেষ্টা করা যাক, কল্পনা করার চেষ্টা করা যাক, আগামী একবিংশ শতাব্দীতে ৫০ কিংবা ১০০ বছরের মধ্যে চাঁদে কি কি ঘটবে।

এই ১৯৭৪ সালে চাঁদের অতিথি হিসাবে গিয়েছেন মাত্র ৪ জন লোকের একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণকারী দল। সামনের

বছরই ১১ জন লোকের একটি অভিযাত্রীদলের কাজ শুরু হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিঃ-পদার্থ বিজ্ঞানী, পৃথিবীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারীদের নিয়ে গড়ে উঠবে একটি স্থায়ী মানমন্দির। অভিযানটি হয়ে উঠবে একটি ইন্‌ষ্টিট্যুটের মত। তারপর চাঁদে গড়ে উঠবে একটি গ্রহান্তরবর্তী জালানি গ্রহণের স্টেশন। তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে উৎপাদন কেন্দ্র— সর্বপ্রথম একটি জালানি সংগ্রহের কেন্দ্র। এই জালানি নিষ্কাশনের ফলে শক্তি উৎপাদন নিশ্চয় সম্ভব হয়ে উঠবে।

যদি আমরা চাঁদে খনিজ বরফ কিংবা হাইড্রোকার্বন খুঁজে পাই তাহলে তো শক্তির প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই। স্ফটিকীকৃত জল অথবা ধাতব যৌগিক পদার্থও পেতে চাই তবে সে সবের জন্যও শক্তির দরকার হবে। এ সবের আগেই শক্তির প্রয়োজন হল বাসস্থানকে উত্তপ্ত করবার জন্য, মালপত্র স্থানান্তরের জন্য, বৈদ্যুতিক কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতিগুলিকে যোগান দেওয়ার জন্য।

চাঁদে পাথুরে কয়লা নেই এবং তা জ্বালাবার অক্সিজেনও নেই। কিন্তু অন্যদিকে চাঁদের আছে সৌরকিরণের সম্পদ। এখানে বাতাসও নেই, মেঘও নেই এবং দিন সব সময়েই পরিষ্কার এবং সূর্যকরোজ্জ্বল। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এখানে ১·৫ অশ্বশক্তিরও বেশি শক্তি পাওয়া সম্ভব। এই জন্যেই প্রথম বছরেই আমরা প্রকাণ্ড আয়না, সৌর চুল্লী, টারবাইন ইত্যাদির সাহায্যে চাঁদে একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা আরম্ভ করব। সমস্ত চান্দ্রদিনব্যাপী এই কেন্দ্রটি

আমাদের শক্তি যোগাবে, কিন্তু সুদীর্ঘ চান্দ্ররাত্রির জন্য শক্তির আরেকটি উৎসকে ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে। সেই শক্তির উৎস পরমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে পারে অথবা হতে পারে সেটা অ্যাকুমুলেটর বা সংগ্রাহক, অথবা চন্দ্র পৃষ্ঠের এবং অভ্যন্তরের তাপমাত্রার যে প্রভেদ, তাকে হয়ত কোন একটা অর্ধপরিবাহকের সাহায্যে আমরা কাজে লাগাতে পারব।

জ্বালানি তৈরির এবং শক্তি উৎপাদনের পরে স্বাভাবিক ভাবেই আসবে ধাতু তৈরির পালা। দরকার হবে যন্ত্রপাতি জোড়াতাড়া দেওয়ার, সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করবার এবং এর জন্য অনেক ধাতু, নল, ফ্রেম ইত্যাদি লাগবে। এ সব কি সবই পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে আসতে হবে? চাঁদে কি লোহা পাওয়া যাবে না? খুব সম্ভব পাওয়া যাবে এবং অক্সিজেনের সঙ্গে অমিশ্রিত অবস্থায়ই পাওয়া যাবে। চাঁদেরই মাল মশলা, চাঁদেরই জ্বালানি এবং যন্ত্রনির্মাণ ব্যবস্থা নিয়ে সেখানে গড়ে উঠবে ধাতু তৈরির শিল্প। খনিশিল্প ও সৌর-বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে যা দরকার এবং গ্রহান্তরগামী বিমানের জন্য যা দরকার তা সবই এইভাবে পাওয়া যাবে।

........সময় এগিয়ে চলেছে। আরম্ভ হয়েছে একবিংশ শতাব্দী। এর মধ্যেই চাঁদে কিছু খনি, কিছু কলকারখানা, গোটা কয়েক ইনস্টিট্যুট, পৃথিবীর দূরবীনের চেয়ে অনেক বড় বড় দূরবিন সহ কয়েকটা মানমন্দির এবং টেলিভিশন প্রচার স্টেশন প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। এই সব কেন্দ্রগুলির কাছে কাছে গড়ে উঠেছে বাসস্থান। বলতে চাইছিলুম এর সবগুলিই

হচ্ছে ভূগর্ভস্থ, কিন্তু চাঁদের জন্য আরেকটা শব্দ চাই—"চন্দ্র-গর্ভস্থ"। কারখানা এবং বাসস্থান দুইই হচ্ছে গুহার মধ্যে। কিংবা চন্দ্রপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে লুকানো। কারণ বিপদজনক আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কিংবা আরো বিপদজনক উল্কাপাত এবং চান্দ্ররাত্রির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং চান্দ্রদিনের প্রচণ্ড উত্তাপের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে তো। সবচেয়ে ভালো হল কারখানা এবং বাসস্থানগুলিকে একেবারে মুখ বন্ধকরা গুহার মধ্যে তৈরি করা। চন্দ্রগর্ভস্থ বাড়িগুলির প্রবেশদ্বারের ছিদ্রপথ দিয়ে ঢুকে বাসিন্দারা জবরজং গ্রহান্তর পোশাকটা খুলে ফেলবেন এবং তাদের তখন মোটামুটি পৃথিবীর মতই মনে হবে।

এখন চাঁদে প্রায় শ' খানেক বৈজ্ঞানিক এঞ্জিনীয়ার এবং কর্মী বাস করছেন। স্ফটিক থেকে নিষ্কাশিত জল তাঁরা পান করেন, নিঃশ্বাস তাঁরা গ্রহণ করেন অক্সাইড থেকে নিষ্কাশিত অক্সিজেন। বাসস্থানগুলির সাথেই সম্পূর্ণ রকমে বন্ধ করা ঢাকা দেওয়া হট্ হাউসের মধ্যে রয়েছে চাঁদের যৌথ খামার। অবশ্য চাঁদের মাটি কৃষির পক্ষে উপযোগী নয়। এতে দিতে হবে কৃত্রিম সার, কৃত্রিমভাবে যোগাতে হবে হট্ হাউসের উত্তাপ এবং আলো, কার্বনিক এসিড গ্যাস এবং এইভাবে ধীরে ধীরে একে উর্বর জমিতে পরিণত করতে হবে।

বাসস্থানগুলি ছড়ানো রয়েছে বহু দূরে দূরে। লোক চলাচল এবং মালপত্র আনা নেওয়া তাহলে কি করে হয়?

আমরা দেখতে পাব আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জেট্ উড়োজাহাজ। এই সব উড়োজাহাজের ডানা নেই। চাঁদে তো বাতাস নেই কাজেই ডানারও দরকার নেই। কিন্তু চাঁদে রয়েছে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি। চাঁদের সমতল ভূমি দিয়ে মালপত্র টানতে টানতে এগিয়ে চলেছে অ্যাকুমুলেটর লাগানো ক্যাটার পিলার ট্রাক্টার।

এসব কিন্তু এখনো ঘটেনি। আমরা অনেক অনেক পরের ১০০ বছর পরের ঘটনা দেখেছিলাম! এই সেইদিনে পৌঁছানর কাজ আমরা শুরু করেছি মাত্র। আজকের ছাত্র এবং পাঠশালার পড়ুয়ারা এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে তরুণ পাঠকবর্গ—প্রথমেই থাকবে তোমরা।

এরপরের পালা গ্রহগুলির

গ্রহান্তর সমিতির বৈজ্ঞানিক সম্পাদক অধ্যাপক

আ, ই, ভোইয়ে ভোদিন

চাঁদকে জয় করা গিয়াছে। চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছে মানুষ। কয়েক পুরুষ ধরে যে কাজ চলছিল তা সমাপ্ত হয়েছে।—প্রস্তুতি, আলোচনা, তর্ক বিতর্ক, হিসাব, প্রাথমিক পরীক্ষা কার্য, পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সবই এখন শেষ। এখন আরম্ভ হয়েছে নতুন যুগ।—চাঁদকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার যুগ।

যাঁরা চন্দ্র জয়ের প্রস্তুতি করেছেন সেই সব দুঃসাহসী পরীক্ষাকারীরা—সেই সব জ্যোতির্বিজ্ঞানী, রেডিও এঞ্জিনীয়ার,

রাসায়নিক, নির্মাণবিদদের এখন কাজ হবে কি? পৃথিবী থেকে নিয়মিত চাঁদে যাতায়াতের ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করবেন না কি? হ্যাঁ, অবশ্যই করবেন। মহাজাগতিক বিমানের উন্নতিবিধানের জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন না কি? নিশ্চয়ই করবেন। চাঁদ থেকে পাওয়া বস্তুগুলিকে পর্যালোচনা এবং সেগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা তাঁরা করবেন না কি? নিশ্চয়ই তা করবেন। কিন্তু তাই শুধু নয়। নিজেদের গ্রহ থেকে অন্যগ্রহে প্রথম পদক্ষেপ করার গৌরব অর্জন করেই, এই দুঃসাহসী মানুষেরা থেমে যেতে পারেন না। পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যে চাঁদই একমাত্র লক্ষ্য নয়। অন্য লক্ষ্যও তো আছে।

১২টি উপগ্রহ নিয়ে যে বৃহস্পতি, যদি আমরা তার বাসিন্দা হতাম, অথবা ৯টি উপগ্রহ নিয়ে যে শনিগ্রহ অথবা ৫টি উপগ্রহ নিয়ে যে ইউরেনাস-এর কোন একটির বাসিন্দা যদি আমরা হতাম তা হলে এই সব গ্রহের নিকটবর্তী অনেকগুলি উপগ্রহের পর্যালোচনা করতেই আমাদের বহু বছর কেটে যেত। কিন্তু বেচারা পৃথিবীর মাত্র একটিই উপগ্রহ—শুধু চাঁদই। আমাদের ধারে কাছে চাঁদ ছাড়া আর কিছুই নেই। অতএব এর পরের পালাটা হয়ে যাচ্ছে অনেক কঠিন এবং লক্ষ্যটাও হচ্ছে সুদূর—সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহ হবে এবার আমাদের লক্ষ্য। এবং স্বভাবতই সবার আগে লক্ষ্য হল আমাদের প্রতিবেশী—মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহ।

পৃথিবীর চেয়ে শুক্র হচ্ছে সূর্যের বেশি কাছে এবং উত্তাপও

পায় অনেক বেশি। আয়তন এবং Mass বা ভরের দিক থেকে শুক্র প্রায় পৃথিবীরই মত। শুক্রে বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ঘন এবং তাতে কার্বনিক এসিড্ গ্যাসের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। আর আমাদের "সবচেয়ে নিকটবর্তী" যে গ্রহ, তার সম্বন্ধে বিজ্ঞান সাধারণভাবে এইটুকু মাত্রই বলতে পারে। সুন্দরী ভেনাস (মানে শুক্র) তার মুখখানাকে ঘন মেঘের ঘোমটার আড়ালেই লুকিয়ে রাখে। এই পুরু ঘোমটার আড়ালে কি কোনো গোপন রহস্য লুকানো রয়েছে? উদ্বেলিত মহাসাগর, রহস্যময় ঝঞ্ঝাবাত্যা, বৃষ্টি অথবা উত্তপ্ত বালুর মরুঘুর্নি কি সেখানে আছে? জীবন কি সেখানে নানা বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে? জীবনের আরম্ভ মাত্র? অথবা, সেখানটা কি শুধু নিস্তব্ধ মরুরাজিতে পরিপূর্ণ? সেখানে দিনটা কি নির্মল না অনতিউচ্চ কালো মেঘরাশির নীচে অনন্ত গোধুলিময়? এখন পর্যন্ত আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি।

মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা অবশ্য অনেক বেশিই জানি। এই রুক্ষ গ্রহটি আমাদের চেয়েও সূর্যের অনেক দূরে। এবং সূর্যের উত্তাপও পায় অনেক কম। সেখানে বায়ুমণ্ডল আছে, কিন্তু আমাদের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মতই তা অত্যন্ত পাতলা। তাই গ্রহটির উপরিভাগ লক্ষ্য করতে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের বাধা বেশি থাকে না। আমরা এখান থেকে মঙ্গলের মধ্যকার রক্তাভ "মহাদেশীয়" অঞ্চল (অনুমান করা হয়ে থাকে এগুলি মরুভূমি) এবং সবুজাভ মহাসাগরীয় অঞ্চল (সম্ভবত অঞ্চলটা

গাছপালা ঢাকা) দেখতে পাই। যেখানে উদ্ভিদ্ আছে সেখানে উদ্ভিদ্ভোজী প্রাণীও থাকা সম্ভব। মঙ্গলের ফুল, মঙ্গলের কীট পতঙ্গ দেখতে কত চিত্তাকর্ষক হত। কত লোভনীয় লাগত পৃথিবীর জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করতে। সেখানে জীবনের বিকাশের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারলে তা কত কৌতুহলোদ্দীপক হত। আমাদের জীব-তাত্ত্বিকরা এসব থেকে কতকিছু জানতে পারত। আর সেই খালগুলোই বা কি? উপত্যকার মধ্য দিয়ে জল প্রবাহেরই দৃশ্য কি এগুলো? না, বহু লেখক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেমন কল্পনা করেছেন যে এগুলো মঙ্গলের এঞ্জিনীয়ারদের তৈরি কৃত্রিম জল সেচের অঞ্চল, তাই এগুলো?

এখন আগে কোথায় যাত্রা করা যাবে—মঙ্গলে না শুক্রে?

সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা আগে মঙ্গলেই যাব, তারপর যাব শুক্রে। আগে কোথায় যাওয়া দরকার, সেই হিসাব করেই যাত্রা হবে। তবে যাত্রার অগ্রগণ্যতাটা আমাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে যান্ত্রিক সম্ভাবনার উপর। যেখানে যাওয়া সহজ হবে আমরা প্রথমে সেখানেই যাব।

সবার আগে দূরত্বের কথা ধরা যাক। পৃথিবী, মঙ্গল এবং শুক্র এই তিনটি গ্রহই পরস্পরের কাছাকাছি থেকে উপবৃত্তের কক্ষপথে সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে। একবার পরিক্রমা শেষ করতে এক একটির এক এক রকমের সময় লাগে।

এদের গতিবেগও ভিন্ন ভিন্ন। গ্রহগুলি সূর্যের যত কাছে হবে তত দ্রুত হবে তাদের গতি। গ্রহগুলির পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পৃথিবী থেকে শুক্রের মধ্যেকার সর্বনিম্ন দূরত্ব হল ৪০ মিলিয়ন কিলোমিটার। আর মঙ্গলের হল ৫৬ মিলিয়ন কিলোমিটার। শুক্রের দূরত্ব মঙ্গলের দূরত্বের চেয়ে প্রায় একচতুর্থাংশ কম। তাহলে কি শুক্রে যাওয়াই আমাদের পক্ষে বেশি সহজ হবে ? তা মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে শুক্রে উড়ে যেতে জালানির খরচ একচতুর্থাংশ বেশিই হবে। এর মানে কি ?

গ্রহান্তর যাত্রার সাধারণ নিয়মকানুনগুলি পৃথিবীতে বিমান চলাচলের নিয়মকানুনের সঙ্গে মেলে না। উড়োজাহাজের এঞ্জিন সর্বদাই চালু থাকে। আর গ্রহান্তরগামী বিমানের এঞ্জিন বহুদিন ও বহুমাসব্যাপী যাত্রার প্রথম কয়েকটি মিনিট মাত্র কাজ করে। যাত্রারম্ভ করার সময় অর্জন করা গতিবেগ টুকুর উপর ভিত্তি করেই গ্রহান্তরগামী বিমান উড়ে চলে যায় সুদূরে। এই সময়টাতে এঞ্জিন কোনই কাজ করে না, এক ফোঁটা জালানিও খরচ হয় না। কাজেই গ্রহান্তর যাত্রায় দূরত্বটা প্রধান বিষয় নয়। জালানির ব্যয়টাই হচ্ছে আসল। আর জালানির ব্যয় হয় প্রধানত আকর্ষণশক্তিকে অতিক্রম করতে গিয়েই।

এখন তাহলে হিসেব করা যাক কোন্ বিমান যাত্রাটা বেশি কঠিন হবে—যেটা মঙ্গলে যাবে সেটা, না যেটা শুক্রে যাচ্ছে সেটা। উভয় বিমানকেই পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম

করতে হবে। মঙ্গলযাত্রী বিমানের পক্ষে সূর্যের আকর্ষণকে অতিক্রম করা বেশ একটু কষ্টকর হবে।

এই গ্রহদুটিতে অবতরণ করা এবং সেখান থেকে উড্ডয়ন আরম্ভ করার বিষয়টা দেখা যাক। শুক্রের ভর পৃথিবীর চেয়ে কিছু কম। শুক্র থেকে যাত্রারম্ভ করার সময় সেকেণ্ডে ১০.৩ কিলোমিটার গতিবেগ দরকার হবে। মঙ্গল গ্রহের ব্যাপারে এটা খুবই কম হবে, সেখানে বিচ্ছিন্নতার গতিবেগ দরকার হবে সেকেণ্ডে ৫ কিলোমিটার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শুক্রের থেকে যাত্রারম্ভ করা অনেক বেশি শক্ত। গ্রহটির নিজস্ব যে-আকর্ষণকে আমাদের অতিক্রম করতে হবে তাও দ্বিগুণ। মঙ্গলের নিকটবর্তী হয়েই বিমানটি সেকেণ্ডে ৫ কিলোমিটার গতিতে তার দিকে পড়তে থাকবে। কিন্তু শুক্রের ক্ষেত্রে গতিবেগ হয়ে যাবে সেকেণ্ডে ১০.৩ কিলোমিটার। জ্বালানি খরচ করে এঞ্জিন চালিয়ে ঐ গতিবেগকে অচল করে দিতে হবে। শুক্রের বায়ুমণ্ডল আমাদের কাছে অপরিচিত। সে বায়ুমণ্ডল দ্বারা ঐরকম গতিবেগকে আমরা কিছুতেই পুরোপুরি রুদ্ধ করতে পারব না। কিন্তু অন্যদিকে উড্ডয়ন আরম্ভের সময় এই বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতাকেই আমাদের সুনিশ্চিত ভাবে অতিক্রম করতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শুক্রে অবতরণ করার এবং সেখান থেকে পুর্নযাত্রার জন্য অনেক বেশি জ্বালানি খরচ হবে। কাজেই কোথায় আগে যাত্রা করা হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করলে তা দাঁড়ায়ঃ প্রথমে—মঙ্গলে, তারপর—শুক্রে।

এখন দরকার হচ্ছে যাত্রাপথ ঠিক করবার। যেমন চাঁদে যাত্রার সময় সবচেয়ে কম জালানি খরচ হয় এমন একটা পথ বেছে নেওয়ার দরকার হয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও তেমনি পথ ঠিক করতে হবে। সোজাসুজি উড়ে যাওয়া সম্ভব কি ? গ্রহান্ত-র্বর্তী মহাশূন্যে সবচেয়ে সোজা পথটি কখনই সবচেয়ে সহজ পথ হয় না। একথা ভুললে চলবে না যে যেখান থেকে আমাদের বিমান ছাড়বে সেই এরোড্রোমটি, অর্থাৎ পৃথিবী নিজেই সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার গতিতে সূর্যের চারি-দিকে ঘুরছে। কক্ষপথের সঙ্গে সমকোণ করে সবচেয়ে সোজা পথে মঙ্গলে যেতে হলে প্রথমেই এই পৃথিবীর গতিবেগকে অচল করে দিতে হবে। মঙ্গলও সেকেণ্ডে প্রায় ২৪ কিলো-মিটার গতিতে নিজস্ব পথে ঘুরছে। সুতরাং কক্ষপথের সঙ্গে সমকোণ করে মঙ্গলের দিকে উড়ে যেতে যেতে বিমানটিকে আবার সেকেণ্ডে এই ২৪ কিলোমিটার গতিবেগই সৃষ্টি করতে হবে; তা না হলে গ্রহটির পিছনে পড়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে একবার গতিবেগকে অচল করে দিতে হবে। তারপর গতিবেগ আবার অর্জন করতে হবে। তাতে অযথা প্রচণ্ড পরিমাণ জালানির খরচ হবে।

এইভাবে ওড়ার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি এমনভাবে ওড়া যায় যাতে পৃথিবীর গতি বিমানটাকে বাধা না দিয়ে সাহায্যই করে। তা করতে হলে এমন একটা উপবৃত্তের পথ ধরে উড্ডয়ন হওয়া দরকার যে উপবৃত্ত একটা বিন্দুতে স্পর্শ করবে পৃথিবীর কক্ষপথকে আর অন্য আরেকটা দূরবর্তী

বিন্দুতে স্পর্শ করবে মঙ্গলের কক্ষপথকে (অথবা শুক্রের)। এই উপবৃত্তটি এমন হবে যার মেরুদণ্ড সূর্যের মধ্য দিয়ে চলে যাবে। এই রকম একটা পথ ধরে মঙ্গল কিংবা শুক্রের দিকে যেতে যেতে সূর্যের চারিদিকে বিমানটির একটি অর্ধ আবর্তন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর এই রকম একটা বক্র পথ দিয়ে গিয়ে মঙ্গলে পৌঁছতে আমাদের লেগে যাবে ৮½ মাস, আর আমাদের অতিক্রম করতে হবে ৬০০. মিলিয়ন কিলোমিটার পথ। শুক্রে যাবার পথটা অপেক্ষাকৃত কম হবে—"মাত্র" ৪০০ মিলিয়ন কিলোমিটার, সময় লাগবে ৫ মাস।

চাঁদে যাত্রার সঙ্গে এই যাত্রার পার্থক্যটা বিরাট। চাঁদে যাত্রায় লাগে কয়েকদিন, আর এক্ষেত্রে লাগছে কয়েক মাস। চাঁদের ক্ষেত্রে দূরত্ব কয়েক শত সহস্র কিলোমিটার আর এক্ষেত্রে দূরত্ব কয়েক শত মিলিয়ন কিলোমিটার। দূরত্বটা বেশি হচ্ছে কয়েক সহস্র গুণ, আর সময়টাও বেশি হচ্ছে কয়েক শত গুণ, ঝামেলা যা বাড়বে তার তো কোন পরিমাপই নেই।

ধরা যাক মজুত সঙ্গে নেওয়ার সমস্যা। চন্দ্রে যাত্রার সময় পাঁচ সপ্তাহের খাবার দাবার এবং অক্সিজেনের মজুত নিয়ে যেতে হয়েছিল এবং তার ওজনও খুব বেশি হয়নি। মঙ্গলে যাতায়াতের মোট সময় হবে কয়েক বৎসর। যেতে লাগবে ৮½ মাস, ফিরতি পথে ৮½ মাস আর গ্রহটির সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে আরো ১৫

মাস। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি যাত্রীর জন্য দরকার হবে টন টন খাদ্য, পানীয় এবং অক্সিজেন।

তারপর হল উল্কাপিণ্ডের বিপদ। চাঁদে যাত্রার সময় আমরা এই সব গ্রহান্তর্বর্তী উল্কাপিণ্ডকে খুব একটা ভয় পাই নি। কেননা, উল্কাপিণ্ডের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কিন্তু যদি আরো একশো গুণ বেশি দূরে যেতে হয় তবে উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় একশো গুণ এবং কি করে এই সাংঘাতিক বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার হয়ে পড়ে।

তারপর আছে ওজনহীনতার সমস্যা। পৃথিবী থেকে চাঁদে যাতায়াতে সময় হচ্ছে মাত্র দুদিন। এই অল্প সময়ের জন্য "গ্রহান্তর পীড়া"কে আমরা তেমন একটা ভয় পাই নি। ভ্রমণকারীরা বলতে পারতেন, "খুব খারাপ হলে না হয় দুদিনই ভুগব।" কিন্তু ৬ মাস ধরে গ্রহান্তর পীড়ায় ভোগা তো অসম্ভব। তাতে যাত্রীদের স্নায়ুতন্ত্রের গুরুতর গোলমাল দেখা দিতে পারে। হয়ত বিমানের মধ্যে কৃত্রিম ওজনই সৃষ্টি করতে হবে যা করা মোটেই সহজ হবে না।

এরপর আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে জালানির সমস্যা। হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ ধরে গেলেও, মঙ্গল পর্যন্ত যাওয়া, সেখানে অবতরণ করা এবং পরে পৃথিবীতে ফিরবার জন্য অত্যন্ত বেশি জালানির দরকার হবে। "চাঁদ—১" বিমানে জালানির ওজন হয়েছিল শূন্য বিমানের

ওজনের ৯ গুণ ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাতেও হবে না, জালানির ওজন হতে হবে শূন্য বিমানের ওজনের ১৬০ থেকে ১৭০ গুণ। ৫০ টন ওজনের একটা বিমানে জায়গা করে দিতে হবে ৮ থেকে ৯ হাজার টন জালানির। এই রকম একটা বোঝার জায়গা করে দেওয়ার জন্য বিমানের ওজন এবং আয়তন অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং তার জন্য আবার বাড়াতে হবে জালানির পরিমাণ।

এর মানে কি এই যে, চন্দ্র অভিযানের বেলায় পৃথিবী সমীপবর্তী যে মহাশূন্যটা আমাদের পক্ষে অতিক্রমনীয় ছিল, মঙ্গল অভিযানের ক্ষেত্রে সেটা অনতিক্রমনীয় হয়ে গেল? তা নিশ্চয়ই নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে মাত্র ২০ বছর আগেও তো অনেকের কাছেই চাঁদে যাওয়াটা একটা আকাশকুসুম কল্পনা কিংবা আজগুবি গল্প বলে মনে হত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছুকালের মধ্যেই, কুড়ি বছরের অনেক আগেই পৃথিবীর দূত সহ গ্রহান্তরগামী বিমান মঙ্গলে যাত্রা করবে এবং তারপরেই যাত্রা করবে শুক্রে।

দুটো পথ আছে যে পথে বিজ্ঞান অন্যান্য গ্রহে যাবার এই সমস্যা সমাধান করার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

প্রথম পথ হল, রকেট এঞ্জিন থেকে নির্গত গ্যাসের গতিবেগ বৃদ্ধি করা। এই গ্যাসের এখনকার যে গতিবেগ অর্থাৎ সেকেণ্ডে দশ কিলোমিটার, তাকে সেকেণ্ডে আরো কুড়ি কিলোমিটার বাড়িয়ে দিতে পারলেই পৌঁছুনো যাবে মঙ্গলে। কিন্তু রকেট নির্গত গ্যাসের গতিবেগ দ্বিগুণ করাই যখন সহজ
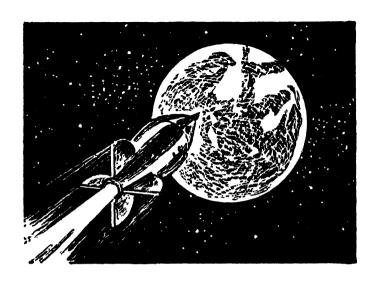
নয়, তখন তিনগুণ করা তো আরো কঠিন। কিন্তু তাওতো গত কুড়ি বৎসরে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পথ হল, পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যে জালানির যোগান দেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন বহিঃসীমানায় জালানি যোগান দেওয়া উড়ন্ত স্টেশন এবং তার জন্য পৃথিবীর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করা প্রয়োজন। অথবা চাঁদে জালানি যোগান দেওয়ার বন্দোবস্ত করা।

এসবের চেয়ে অনেক সোজা হল মঙ্গলে যাওয়া কিন্তু অবতরণ না করা, মানে ৪০ থেকে ৫০ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব থেকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীতে ঘুরে আসা। এরই জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি।

এর চেয়ে আরেকটু শক্ত কাজ হল কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে মঙ্গলের চতুর্দিকে পরিক্রমা করা। তার চেয়েও আরো একটু বেশি শক্ত কাজ হবে মঙ্গলের উপগ্রহগুলির কোন একটিতে অবতরণ করা। অবশ্য মূল গ্রহটিতে অবতরণ করার থেকে এটা অনেক সহজ। মঙ্গলের দুটি খুবই ছোট্ট চাঁদ আছে। এগুলো হল "উড়ন্ত পাহাড়", এদের ব্যাসার্ধ হল সবশুদ্ধ কয়েক কিলোমিটার মাত্র। এই সব উপগ্রহগুলিতে আকর্ষণের শক্তি এত কম যে, পকেট থেকে একটা পেন্সিল পড়ে গেলে সেটার পাথরের উপর গিয়ে পড়তে লাগবে ২০ সেকেণ্ড। লাফঝাঁপ এখানে খুবই সাবধানে দিতে হবে। লাফটা একটু জোর হলেই লম্ফপ্রদানকারী আকস্মিকভাবে উপগ্রহটি থেকে "ছিটকে" বেরিয়ে যেতে পারে এবং তারপর এই অসাবধানী লম্ফপ্রদানকারীটি নিজেই মঙ্গলের তিন নম্বর উপগ্রহে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

শুক্রের উপগ্রহ নেই। অবতরণের আগে যদি শুক্র গ্রহকে পরীক্ষা করে দেখতে হয় তবে বিমানটিকে অস্থায়ীভাবে এর একটি কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হতে হবে; অর্থাৎ গ্রহটির কাছাকাছি থেকে একে পরিক্রমা করতে হবে। যাই হোক এই প্রাথমিক উড্ডয়ন থেকে আমরা কিছু জানতে পারব কি না, মেঘের ঐ আচ্ছাদনটা সরে যাবে কিনা অথবা শুধু রাডারের সাহায্যেই শুক্র পৃষ্ঠকে জানতে হবে কিনা তা অবশ্য আমরা বলতে পারছি না।

অন্যান্য গ্রহে যাত্রা আরো অনেক বেশি শক্ত কাজ।

সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ হল বুধ। এর ভর পৃথিবীর ভরের ২৫ ভাগের একভাগ। এখানে বিচ্ছিন্নতার গতিবেগও খুব কম, কিন্তু জালানির খরচ শুক্রে যাত্রার খরচের থেকে অনেক বেশি। বুধ সূর্যের খুব কাছে হওয়ায় সৌর আকর্ষণকে প্রতিরোধ করতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। বুধে যাত্রা খুবই বিপদজনক এবং কষ্টদায়ক। বিমান এগিয়ে যাবে সূর্যের দিকে, অনন্ত উত্তাপের অঞ্চলে অনেকগুলি মাস কাটাতে হবে। বুধের সূর্যালোকিত দিকটাতে তাপমাত্রা ৪০০ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে।

সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকটা হচ্ছে অনন্ত ঠাণ্ডার অঞ্চল। এই অঞ্চলের গ্রহগুলি, যথা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের দিকে যে সব দুঃসাহসী অভিযাত্রী যাত্রা করবে, বিপদ হবে তাদেরও। এই সব গ্রহ বহু দূরে রয়েছে। এগুলিতে যাত্রাকাল হবে বহু বৎসর ব্যাপী। শুধু অভিযাত্রীদেরই যে বিপদ তাই নয়, বিপদ হবে নির্মাণ-কারীদেরও। সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকের এই গ্রহগুলির ভর, বিশেষত বৃহস্পতির ভর, পৃথিবীর ভরের থেকে অনেক বেশি। এ হল একটা অতিকায় গ্রহ। এই জন্যই বৃহস্পতি, শনি এবং দূরবর্তী গ্রহগুলিতে অবতরণের পরিকল্পনা বহু বছর অসম্ভবই থেকে যাবে। সুতরাং উপগ্রহ থেকে এই গ্রহগুলিকে পর্যবেক্ষণ করাই এখন আমাদের কাজ হবে। এই রকম পর্যবেক্ষণের জায়গা নির্বাচন করা একটা বিরাট কাজ।

অবশেষে উল্লেখ করা দরকার যে……আবার কি উল্লেখ

করা বাকি রইল? মনে হচ্ছে সবই বলা হয়েছে—চাঁদ, গ্রহগুলি, এবং তাদের উপগ্রহগুলি সবের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সূর্যে তো আর যেতে হবে না। সৌরজগতের বাসিন্দার সংখ্যা কিন্তু আরো অনেক বেশি। গ্রহ এবং উপগ্রহগুলি ছাড়াও হাজার হাজার অ্যাষ্টেরয়েড্ বা গ্রহকণিকা এবং ধূমকেতু আছে। কয়েকটি গ্রহকণিকা মঙ্গল এবং শুক্রের চেয়েও অনেক কাছ দিয়ে পৃথিবীকে অতিক্রম করে যায়, যেমন, এপোস, অ্যাপোলোস, অ্যাডোনিস্, হার্মিস। গ্রহ-কণিকাগুলির ভর মিলিয়ন বিলিয়ন টন হলেও গ্রহগুলির তুলনায় তা সামান্যই। অনেক গ্রহকণিকাতে যাওয়া চাঁদে যাত্রার থেকে বেশি কঠিন নয়। চাঁদের চেয়ে গ্রহ-কণিকাগুলি পৃথিবী থেকে অনেক বেশি দূরে হলেও সেগুলিতে যেতে বেশি জ্বালানির দরকার হয় না।

কিন্তু এই সব গ্রহকণিকায় যাওয়ার কোনো গুরুত্ব আছে কি? একটা প্রাণহীন পাথরের পিণ্ডে অবতরণ করার প্রয়োজন কি? গ্রহকণিকাকে একটা প্রকাণ্ড আকাশচারী বস্তুপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষ বলেই মনে করা হয়। গ্রহকণিকাকে পর্যালোচনা করে আমরা এই বস্তুপিণ্ডটির আভ্যন্তরীণ গঠন এবং তার ধ্বংসের কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারব।

এছাড়াও একটা সুবিধাজনক গ্রহকণিকা বেছে নিয়ে আমরা তাতে করে সৌরজগতে একটা প্রমোদ ভ্রমণ সেরে আসতে পারি। গ্রহান্তর গমন বিদ্যার জন্মদাতা ৎসিওল্‌কভস্কিও গ্রহকণিকাগুলিকে এইরকমভাবে ব্যবহার

করার কথা চিন্তা করেছিলেন। হিদালগো গ্রহকণিকাটিকে এইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই গ্রহকণিকাটি একটা খুব বড় উপবৃত্তের পথ ধরে পরিক্রমা করে। এটি পৃথিবীকে অতিক্রম করে যায় তার কক্ষপথের খুব কাছ দিয়ে এবং এর সবচেয়ে দূরবর্তী বিন্দুটি গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়ে, প্রায় শনির কক্ষপথ পর্যন্ত। হিদালগো আমাদের সৌরগজতের মধ্যে ঘুরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এই ভ্রমণ-কাল হবে বহুদিন ব্যাপী। এই ভ্রমণ শেষ হতে লাগবে চৌদ্দটি বৎসর। সুতরাং, দেখতেই পাচ্ছ, সৌরমণ্ডল নিয়ে অনেক কিছু করার কাজ ভবিষ্যতের অনুসন্ধানীরা পাবেন। চন্দ্রে অভিযান হল গ্রহান্তরযাত্রাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ কাজ। আরো বড় আরো জটিল বহুবর্ষব্যাপী ভ্রমণ বাকি রয়েছে। এর জন্য দরকার হবে সাহস, সহ্যশক্তি এবং দরকার স্বদেশ এবং বিজ্ঞানের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সদাপ্রস্তুত কর্মোদ্যোগ।

বিজ্ঞানের ফ্রণ্ট লাইন

অধ্যাপক **ম, আ, সিজফের** চাঁদ থেকে পাঠানো রিপোর্টাজ ॥

বৃষ্টি-সাগর। ২৯শে নভেম্বর, রাত্রি ৮টা—০০ মিনিট মস্কো সময়।

না, ডাক্তার আকোপিয়ান এখন মাইক্রোফোনের সামনে নেই। আলিঅশা সোকোলফের সাথে ডাক্তার এখন গেছেন দূরে প্লাতোন জ্বালামুখে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্যে। "বাড়িতে" এখন আছি শুধু আমি আর ইউরি নিকোলায়েভিচ্ তামারিন।

দেখছেন তো চাঁদের সঙ্গে আমরা কেমন মানিয়ে নিয়েছি। রকেটটাকে আমি "বাড়ি" বলে ফেলেছি। আমাদের এই ধাতবমিনারের বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে সমতল ভূমির নির্জনতার মধ্যে। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা নিজেদের বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছি। কালো রংয়ের আকাশের গায়ে সূর্য দেখে এখন আর আমরা আশ্চর্য হই না। অবাক হই না নিজেদের শিশুর মত ওজন দেখে আর ধীরে ধীরে দানবিক পা ফেলে হাঁটায়। আমাদের এখন চাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়েছে আর পরিবেশের সঙ্গেও আমরা বেশ খাপ খেয়ে গেছি। ঐসব ছোট ছোট জ্বালামুখ, পাহাড় আর গিরিখাতের নাম উদ্ভাবন করতে আমাদের যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হবে। তা না করে চলে না। রাস্তায় পরস্পরের সঙ্গে "এই পাহাড় থেকে ঐ উপত্যকায়, সেই পাহাড়ের কাছে সেই গিরিপথের মধ্যে"—এমন ভাবে বলা একটা অসম্ভব ব্যাপার। সময় সময় ভূতাত্ত্বিক নমুনাগুলি হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে আমি ভুলেই যাই যে এই পাথরগুলি চাঁদেরই টুকরো। কিন্তু মাঝে মাঝে মাথা তুলে তারা ভরা আকাশের গায়ে পৃথিবীর প্রকাণ্ড কাস্তেটার দিকে তাকাতেই হয় আর মুচ্‌কি হেসে পুনরুক্তি করতে হয়, "হ্যাঁ, ঠিক, আমরা এখনো চাঁদেই রয়েছি।"

আমরা প্রায়ই পৃথিবীর দিকে তাকাই, কিন্তু ওটা আমাদের নিজেদের গ্রহ বলে যে তাকাই তা নয়। চাঁদের গোলকধাঁধার মধ্যে পৃথিবী আমাদের কম্পাসের কাজ করে।

বৃষ্টি-সাগরের মধ্যে এটা দক্ষিণ-দক্ষিণপূব দিক নির্দেশ করে। আকাশের গায়ে যেন আটকে রয়েছে পৃথিবী আর তারাগুলি খুব ধীরে ধীরে পূব থেকে পশ্চিমে তার কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে মনে হয় তারাগুলি তার চারদিকে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে একদিনে, আর চাঁদে বসে মনে হয় তারাগুলির চাঁদের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে লাগে এক মাস।

চাঁদ থেকে সব চেয়ে পরিচিত জিনিস যা আমরা দেখেছি তা ঐসব তারাগুলি। আমরা রয়েছি চাঁদের উত্তর গোলার্ধে, তাই সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলগুলিই আমাদের পরিচিত—উত্তরে ঐ দেখা যাচ্ছে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বঁড়শিটা, সোয়ানের ক্রস চিহ্ন, ছোট্ট মাথাওয়ালা সাপের মত ড্রাগন। সেই একই সব তারা কিন্তু দেখতে আরো বড়। সমস্ত আকাশময় ছড়ানো রয়েছে জ্বল্‌জ্বলে কণাগুলি। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ছায়াপথ। আর পুরানো পর্যবেক্ষক আমি, উৎসাহের সঙ্গে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, কি নির্মল! কি পরিষ্কার! পর্যবেক্ষকের পক্ষে কি চমৎকার জায়গা!

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যে পর্যবেক্ষণের পক্ষে রীতিমত বাধা সৃষ্টি করে তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই জানেন। মেঘে, ধূলোয়, শহরের আলোর প্রতিফলনে আমাদের পর্যবেক্ষণের কাজ পণ্ড হয়ে যায়। দূর দেশে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করবার জন্য—বহু অর্থ ব্যয় করে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করে কত পর্যবেক্ষকদলকে অভিযান করতে পাঠান হয়েছে; কিন্তু অভিযাত্রীরা পর্যবেক্ষণ না করে শূন্য হাতে

ফিরে এসেছে শুধু এই জন্যেই যে গ্রহণের ঠিক পরেই একটা মেঘ এসে সূর্যকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে।

সূর্য এবং তারাগুলি থেকে মহাশূন্যের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বেতার তরঙ্গ, ইন্‌ফ্রা রেড্ রশ্মি, আল্‌ট্রাভায়োলেট, রঞ্জন এবং গামা রশ্মি সঞ্চারিত হয়। তাছাড়াও মহাশূন্যের মধ্যে থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয় মহাজাগতিক রশ্মি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাঁকুনির মত কাজ করে। দৃশ্যমান রশ্মিগুলি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলে আসে, কিন্তু আল্‌ট্রাভায়োলেট ও ইন্‌ফ্রা রেড রশ্মি এবং বেতার তরঙ্গের একটা অংশকে বায়ুমণ্ডল ধরে রাখে আর মহাজাগতিক রশ্মিগুলিকেও পরিবর্তিত করে দেয়। এই অদৃশ্য রশ্মিগুলির জন্যই বায়ুমণ্ডলকে রঙিন ছাঁকুনির মত মনে হয়। বায়ুমণ্ডল রশ্মিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, কাজেই আমরা পাই একটা অসম্পূর্ণ সেট্। বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরেই শুধু আমরা সূর্যের বর্ণালির সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করতে পারি।

এই পর্যালোচনায় কি পাওয়া যাবে? এতে আমরা সূর্যকে আরো ভাল করে জানতে পারি। আর সূর্য তো আমাদের কাছে শুধু প্রাণ, উত্তাপ, আলোর উৎসই নয়; আমাদের পক্ষে সূর্য একটা খুব সুবিধাজনক, স্বাভাবিক বীক্ষণাগারও বটে। ৬ হাজার ডিগ্রী বা তদুচ্চ তাপমাত্রার মধ্যে বিভিন্ন পদার্থকে পর্যালোচনা করতে হলে সূর্যেই তা করা যায়। পৃথিবীতে এরকম উচ্চ তাপমাত্রা তৈরি করা খুবই শক্ত।

চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, কাজেই অদৃশ্য রশ্মিগুলিকে বাধা দেবার মত ছাঁকুনিটাও নেই। চাঁদে আমরা স্থায়ী হয়ে বসতে পারলে দৃষ্টিবহির্ভূত জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসার হবে, উদ্ভব হবে ইন্‌ফ্রা রেড জ্যোতির্বিজ্ঞানের এবং শীতল আকাশচারী বস্তুপিণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানের এবং মহাজাগতিক রশ্মিসমূহের পর্যালোচনার কাজে অগ্রগতি হবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বহু রশ্মিকেই হয় আটকে রেখে দেয় নতুবা ফিরিয়ে দেয় মহাশূন্যে। বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরে গেলে, যেমন চাঁদ থেকে তারাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলির ফটো তোলা সম্ভব। এখানে তারাগুলির উজ্জ্বলতা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে এবং আজ পর্যন্ত যতদূর পর্যন্ত তারাকে দেখা গেছে তার থেকেও ১.৪ গুণ বেশি দূরের তারাকেও দেখতে পাওয়া যায়। চাঁদে একটা বড় দূরবীক্ষণ বসালে ব্রহ্মাণ্ডটা আমাদের কাছে ১.৪ গুণ বেশি প্রসারিত হয়ে যাবে। চাঁদে পৃথিবীর থেকেও অনেক বড় দূরবীক্ষণ বসানো সম্ভব। পৃথিবীতে আকর্ষণের শক্তি আমাদের বাধা হয়ে থাকে। এর ফলেই আয়নাটা ঝুঁকে পড়ে এবং প্রতিচ্ছবিটা বিকৃত হয়ে যায়। চাঁদে আকর্ষণের শক্তি কম, তাই দূরবীক্ষণগুলিও বড় করা সম্ভব। চাঁদ থেকে আমরা দূরতম স্থানও খুব ভালভাবে দেখতে পাব। এখানে তোলা ফটো খুব পরিষ্কার এবং নিখুঁত হবে। চাঁদে যাবার রাস্তা করে এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিজেদেরই কাজ খুব বেড়ে গিয়েছে।

অনেক দূরের তারা ও নীহারিকা এবং যেসব আলো রাতের আকাশে বিলীন হয়ে যায় সে সবের পর্যালোচনা করার জন্য আমরা একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছি। এই কাজের মধ্য দিয়ে নতুন গ্রহকণিকার খোঁজও আমরা করব। এরকম প্রায়ই ঘটে থাকে যে—একটা নতুন গ্রহকণিকার খোঁজ হয়ত পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয়বার ভাল করে এটাকে দেখবার এবং এর পথের হিসাব করবার আগেই আবহাওয়া মেঘলা হয়ে গেল; তখন আর এক সপ্তাহ কি দু' সপ্তাহ ধরে সেই গ্রহকণিকাটিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে হল। আর বড় গ্রহগুলিকে দেখা তো আরো শক্ত। বড় দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়েও এদের উজ্জ্বল আবছা একটা ছোপের মত দেখায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরবীক্ষণের পাশে দাঁড়িয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করে থাকতে হয় কখন আবহাওয়া শান্ত হবে এবং প্রতিচ্ছবিটি স্থির হয়ে আসবে।

এক কথায় বলতে গেলে, চাঁদে স্থায়ী হয়ে বসলে আমরা আবার সম্পূর্ণ নতুন করে পর্যবেক্ষণ চালাতে পারব এবং সমস্ত আকাশের ফটো তুলতে পারব। কিন্তু এসব হল পরের কথা। আমাদের এই অভিযানটা একটা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ মাত্র, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ মাত্র। আমাদের সঙ্গে একটা ৫০০ মিলিমিটার দূরবীক্ষণ নিয়ে এসেছি। আর এনেছি একটা প্রশ্নের লম্বা ফর্দ যার সঙ্গে সব বিষয় মিলিয়ে নিতে হবে। যতটা সময় এই কাজের জন্য আমি বরাদ্দ করেছিলাম তা মোটেই যথেষ্ট নয়; কাজেই ঘুমের

সময় থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় চুরি করতে হচ্ছে এবং ঘুরে বেড়ানোর কর্মসূচী ছেঁটে ফেলতে হয়েছে। সাথীরা এজন্যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের আবিষ্কারের নেশা চেপে গিয়েছে, তাদের ইচ্ছা দিগন্তের ওপারে গিয়ে দেখা। চাঁদে দিগন্ত খুবই ছোট। এতে দেখার প্রচণ্ড লোভ হয়, সব সময়ই মনে হয়—এইত দাঁড়িয়ে আছি এই পাহাড়ে আর ঐত শেষ সীমানা—ভারী মজার ব্যাপার। পৃথিবীতে কোনো নতুন আবিষ্কৃত জায়গায় গেলে আমরা কত গর্বের সঙ্গে বলি, "যেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি কোনদিন সেখানে আমি গিয়েছিলুম।" কিন্তু চাঁদে তো কোন জায়গাতেই মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। প্রত্যেকটা উপত্যকাই অদেখা উপত্যকা, প্রত্যেকটা পাথরই অস্পৃষ্ট পাথর। কিন্তু বৃথাই আমি এসব কথা বলছি—আমার মনে হচ্ছে সব পাহাড়ই সমান, মনে হচ্ছে গোটা দশেক দেখে নিলেই যথেষ্ট। আর দেখবার কোনই দরকার নেই। কিন্তু সাথীরাও ঠিক এমনিই আমাকে বোঝান–সব তারাই তো সমান,—মস্কোতে বসেই তো সেগুলি দেখা যেতে পারত।

কিন্তু আজকের দিনটা আমারই দিন বলা যেতে পারে; —অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিন। কেননা আজ সূর্যগ্রহণ—এবং এই গ্রহণ দেখার জন্যে সবাই দূরবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

গ্রহণটা কিরকমভাবে ঘটবে তা আগেই জানা আছে। পৃথিবী এবং সূর্যকে একই সময় দেখা যাবে আকাশে। পৃথিবী

প্রায় স্থির হয়ে থাকবে। সূর্য এগিয়ে যাবে তার দিকে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর কাস্তেটা ক্রমেই সরু আর পাতলা হয়ে যাবে, বাড়তে থাকবে তার শিং দুটো, তার পর এগিয়ে গিয়ে জোড়া লেগে যাবে—'C' অক্ষরটা 'O' র মত হয়ে যাবে। আলোকিত বায়ুমণ্ডলে পৃথিবী দেখাবে একটা অন্ধকার বৃত্তের মত। এই বৃত্তটা একটা ছটার মত হয়ে যেতে থাকবে। তারপর সূর্য চলে যাবে পৃথিবীর পিছনে।

এক কিংবা দুই মিনিটের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবার জন্য যাঁরা ব্রেজিল কিংবা চুকুৎকায় গিয়ে হাজির হন, আমার মনে হয় সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই শুধু আমার অনুভূতিটা বুঝতে পারবেন। চাঁদে সব জায়গা থেকেই গ্রহণ দেখা যায় আর সেটা এক আধ মিনিটের গ্রহণ নয়, কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী গ্রহণ। সাধারণত সূর্যকে একটা অস্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে আড়াল করে অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে গ্রহণ সৃষ্টি করে সূর্যগ্রহণ দেখতে হয়। আমরা গভীর স্থৈর্যের সঙ্গে যে যার কাজ করে যাচ্ছি এবং মাঝে মাঝেই তাকিয়ে দেখছি কালো কাঁচের মধ্যে দিয়ে, সূর্য কি করে একটা অর্ধবৃত্তে পরিণত হয়ে চাঁদের মত হয়ে যাচ্ছে।

তারপর নেমে এল গোধূলি। চাঁদে গোধূলিটা খুবই বিরল বস্তু। ছায়াটা ঘন হয়ে এল তারপর কালো হয়ে গেল। কালো নয়, বন্ধ-করা বাক্সের মধ্যে যে রকম অন্ধকার সেই অন্ধকারই হচ্ছে চাঁদে স্বাভাবিক অন্ধকার। পৃথিবীর চতুর্দিকে জ্যোতির্ময় বৃত্তটা রক্তলাল আগুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর

আমাদের এখানে সব কিছুই লালচে বাদামি রংয়ের হয়ে উঠল।

চাঁদে যখন শিল্পীরা আসবেন, তাঁরাই তখন এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকবেন। খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারের প্রতিই আমাদের নজর রাখতে হয়েছে। বিভিন্ন এক্স্‌পোজারে আমি বর্ণমণ্ডল ও সৌরচ্ছটার সম্পূর্ণ এবং অংশ ভাগের ফটো তুলেছি; তাছাড়া সৌরমণ্ডল এবং বর্ণালীর ফটোও তুলেছি। সব মিলিয়ে কিসের কিসের ফটো উঠেছে জানি না, পৃথিবীতে গিয়ে সেটা দেখা যাবে। সাথীরা এর মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপ-মাত্রার পরিমাপ করেছেন; শৈত্যবৃদ্ধির হিসাব রেখেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠ খুবই তাড়াতাড়ি শীতল হয়ে যায়। গ্রহণ শেষে তাপ-মাত্রা শূন্যের ৭০ ডিগ্রী নিচে নেমে গিয়েছিল। আমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারিনি। কেন না, বিশেষ গ্রহান্তর পোশাকের মধ্যে শৈত্য সৃষ্টির ব্যবস্থার বদলে উষ্ণতা সৃষ্টির ব্যবস্থাই করা ছিল।

এই লাল্‌চে বাদামি আভাযুক্ত রাত্রিটি স্থায়ী হয়েছিল মাত্র দুই ঘণ্টা কাল। তারপর কেমন করে রাত্রি কেটে গিয়ে উষা এল, পৃথিবীর পেছন থেকে কেমন করে বেরিয়ে এল সৌরচ্ছটার রশ্মি তা আমরা দেখেছি। উষা যেমন করে আমাদের এখানে সূর্যোদয় ঘোষণা করে তেমনি করেই সূর্যের আবির্ভাব ঘোষণা করেছে ঐ রশ্মিগুলি। ঐ ত সৌরমণ্ডল দেখা যাচ্ছে, তারপরই দেখা যাচ্ছে সূর্যের কিনারাটা। ছায়াটা সরে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। চাঁদে আবার দিন ফিরে এল।

ফটো তোলা আর পর্যবেক্ষণ করার কাজও দিন ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। এখন শুধু নজর রাখতে হবে কেমন করে দিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠ আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একজন সাথী আমাকে তাড়া দিলেন:

—মিখাইল আন্দ্রেভিচ, আমরা ঠিক করেছি, আজ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে প্লাতোন জ্বালামুখে যাব।

বন্ধুরা অধীর হয়ে উঠেছে। নতুন জায়গা তাদের ডাকছে, তাদের ইচ্ছে সব জায়গায়ই যায়। ঐ জ্বালামুখের মুখের মধ্যে এখনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।

—মিখাইল আন্দ্রেভিচ—তারা নাছোড়বান্দা,—আপনাকে কি সত্যি সাধাসাধি করতে হবে? বাস্তবিক। আমাকে সাধাসাধি করতে হবেই বা কেন? প্লাতোন জ্বালামুখের সম্বন্ধে বিভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে আমিই তো গবেষণার থীসিস লিখেছিলাম। এখনো যাওয়া তো আমার নিজেরই কাজ।

হঠাৎ মনে পড়ল—নাঃ, এখন এটা আর আমার কাজ নয়। এখন আমার কাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাজ; সে কাজ হল—দূরবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে যা দেখা যায় তারই ব্যাখ্যা করা। চাঁদে মানুষ এসে গেছে। এখন এটা পৃথিবীর বাইরে একটা সপ্তম মহাদেশের মতই। পৃথিবীতেও তো এমন মহাদেশ আছে যেটা জনহীন, প্রাণীহীন—যেমন কুমেরু। সুতরাং এখন চাঁদকে পর্যালোচনা করতে হবে অন্য এক বিজ্ঞান দিয়ে, যে বিজ্ঞান সম্ভবত ভূগোলেরই একটা বিশেষ শাখা হবে।

যাই হোক, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে চাঁদ এখন আর পর্যবেক্ষণের বস্তু নয়। এখন এটা হচ্ছে পর্যবেক্ষণের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি। আমরা যেন পৃথিবীকে ৪০০,০০০ কিলো-মিটার এগিয়ে নিয়ে এসেছি; যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে একটা নতুন পর্বতশৃঙ্গ দখল করে সেখানে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি করেছি। এখন বিজ্ঞানের ফ্রন্ট লাইন এগিয়ে চলে এসেছে এখানে এই চাঁদে। এখন এখান থেকে দূরবীক্ষণ দিয়ে আমরা নজর রাখতে থাকব পরবর্তী লক্ষ্যের উপর। কোথায় রক্তাভ মঙ্গল আর নীলাভ শুক্র? দৃষ্টি সীমার মধ্যেই উজ্জ্বল নীলাভ ঐ যে কি একটা! না ওটা শুক্র নয়, ও হল ভেগা। ভেগা গ্রহ নয়—এ হল আরেক সূর্য। ভেগা অনেক দূরে; সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটারের গতিতে ওখান থেকে আমাদের কাছে আলো এসে পৌঁছুতে ২৭ বৎসর লেগে যায়।

আচ্ছা মানুষ কি কোনদিন ভেগার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারবে? সে সম্ভাবনা এখন অনেক দূরে। আমাদের সাধ্য এখনো সীমাবদ্ধ।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে আমাদের শক্তির সীমা নিয়ে আলোচনা করার কোন অর্থ হয় না। সামনে আমাদের অসীম ব্রহ্মাণ্ড আর পিছনে রয়েছে সোবিয়েতের জনগণ: তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের সাহস তাদের জ্ঞানের তৃষ্ণারও নেই কোন সীমা।

সম্পাদকের কাছ থেকে

প্রিয় পাঠকবর্গ।

অধ্যাপক সিজফ্ এবং তার সঙ্গীদের চাঁদে রেখেই তোমাদের এখন ফিরতে হবে ১৯৫৫ সালে।

সম্ভাবনাকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবে পরিণত করে ফেলেছিলাম এবং বহু বছর এগিয়ে চলে গিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে "চাঁদ—১" বিমান এখনো তৈরি হয় নি ; এমন কি, তার পরিকল্পনাই হয়নি। কিন্তু এই বই পড়ে, চাঁদে পাঠানো রকেটগুলির মধ্যে দিয়ে অধুনাতম যন্ত্রবিদ্যার সাফল্য-গুলির কথা তোমরা জানতে পেরেছ এবং গ্রহান্তর যাত্রা কাজে পরিণত হওয়ার পথে এখনো পর্যন্ত যে সব বাধা রয়েছে তাও তোমরা জেনেছ। এই বাধাগুলি এখনো জয় করা যায়নি বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে এগুলো জয় করা হবে নিশ্চয়ই।

আমরা স্বীকার করছি যে অধ্যাপক সিজফ্, এঞ্জিনিয়ার তামারিন, ডাক্তার আকোপিয়ান, পাইলট সোকোলফ বলে আসলে কেউই নেই। তেমনি গ্রহান্তর গমন বিদ্যার কেন্দ্রীয় মিউজিয়ামের ডিরেক্টর নেদেরোফ্, গ্রহান্তর স্টেশনের অধ্যক্ষ সাভেলিয়েফ এবং অন্যান্য বিভিন্ন নামে যাদের রচনা আমরা এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি তারাও আসলে কেউ নেই।

আসলে এই রচনাগুলির লেখক হচ্ছেন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক এবং সাংবাদিকরা। এঁদের নাম তোমরা বইয়ের সামনের দিকে সূচীপত্রে পাবে।

এই বইয়ের নায়করা আসলে কেউই নেই এবং গ্রহান্তর

অভিযাত্রীরা হয়ত সবে জন্মেছে আর তাদেরই মধ্যে হয়ত কেউ কেউ এই বই পড়বে। আর আমাদের পাঠকদেরই মধ্যে অনেকেই হয়ত গ্রহান্তরগামী বিমানের নির্মাণে অংশ নেবে এবং "তাদেরই হাতের তৈরি" বিমান হয়ত তারা চাঁদে পাঠাবে।

আগামী দশকের উদ্ভাবক ও বৈজ্ঞানিক তোমরা,—আমরা তোমাদের সাফল্য কামনা করছি। কল্পনায় নয়, সত্য সত্যই চাঁদে একটি বিমান পাঠানো যাতে যায়, আমরা আশা করি সেজন্য তোমরা তোমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা করবে। আমাদের দিক থেকে আমরাও যে প্রতিজ্ঞা করেছি তখন সে প্রতিজ্ঞাও আমরা পালন করব; অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের মধ্যেই চাঁদে সত্যকার অভিযানের রিপোর্টগুলির ভিত্তিতে একটি দ্বিতীয় সঙ্কলন প্রকাশ করব।

পরিশিষ্ট

কল্পনামূলক 'বৈজ্ঞানিক বই'

"চাঁদে অভিযানে"র নায়কদের সাথে তোমরাও এতক্ষণে ঐ চিত্তাকর্ষক অভিযানটি শেষ করে ফেলেছো। মহাজাগতিক বিমানের নির্মাতারা এবং তাদের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানকর্মীরা এখনো পর্যন্ত যা কাল্পনিক সেই মহাজাগতিক যাত্রার প্রস্তুতি করতে এবং যাত্রাটি কাজে পরিণত করতে যেসব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে, তা বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু আগেই বলা দরকার যে পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যকে আয়ত্তে আনতে গেলে খুবই প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। এই সব বাধাবিপত্তির অতি সামান্য অংশই তোমাদের কাছে তুলে ধরতে পারা গেছে। কিন্তু এতেই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই সমস্যাটা বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যার দিক থেকে কতটা জটিল।

মহাজাগতিক বিমানের চাঁদে যাত্রা এখনো কাজে পরিণত হয় নি ; কিন্তু সন্দেহ নেই যে এই শতাব্দীর পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেই এটা ঘটে যাবে।

পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত এই রকম একটা "শূন্যযাত্রা" কি ভাবে কাজে পরিণত হবে তা দেখিয়ে দেবে ভাবীকাল। এই বইয়ে যেমন ভাবে বর্ণনা করা আছে সেই রকম ভাবেই অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার না করেই তা অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আণবিক এঞ্জিনওয়ালা বিমান তৈরি করতে হবে। আর যদি তাপজ-রাসায়নিক জালানির দ্বারা কাজ করে এমন রকেট ব্যবহার করতে হয় তাহলে প্রথমেই পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করতে হবে—যেটা গ্রহান্তর্বর্তী শূন্যে জালানি যোগানোর স্টেশন হিসাবে কাজ করবে। মহাজাগতিক বিমান-গুলি পৃথিবী থেকে উড়ে এসে এখানে জালানি ভরে নেবে।

এই দুটো পন্থার মধ্যে কোনটা বেছে নেওয়া হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির ফলে কি রকম সম্ভাবনা, বিশেষত কি রকম শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে তারই উপর।

এখন পর্যন্ত একটা জিনিস পরিষ্কার, তা এই যে, আণবিক এঞ্জিনযুক্ত বিমান তৈরি করা এখনকার যন্ত্রবিদ্যার নাগালের বাইরে। পৃথিবীর একটা কৃত্রিম উপগ্রহকে গ্রহান্তর্বর্তী শূন্যে জালানি যোগানোর স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে চাঁদে যাত্রা এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই উপগ্রহে গিয়ে পৌঁছনোর জন্য মহাজাগতিক বিমানের মধ্যে যে পরিমাণ জালানি নিয়ে যেতে হবে তা বিমানটির নিজস্ব ওজনের ৬ গুণ বেশি হবে। নির্গত গ্যাসের গতিবেগ দাঁড়াবে সেকেণ্ডে ৫ কিলোমিটার। কৃত্রিম উপগ্রহটিতে গিয়ে সেখান থেকে বিমানটা প্রয়োজনীয় পরিমাণ জালানি নিয়ে সুদূর যাত্রা চালিয়ে যাবে চাঁদের উদ্দেশে।

মহাজাগতিক বিমানটি যাতে এই উপগ্রহ থেকে চাঁদে উড়ে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে আসতে পারে, তার জন্য যে পরিমাণ জালানি সেখান থেকে নিতে হবে তা বিমানের ওজনের দশগুণ বেশি হওয়া চাই।

গ্যাসের গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে ১০ কিলোমিটার করা যায়, যা শুধু আণবিক এঞ্জিনের সাহায্যেই হওয়া সম্ভব, তাহলে ওজনের এই অনুপাতটা কমে ২.৫—৩.৫ এ দাঁড়াবে। এখনকার সংযুক্ত রকেটগুলি মাত্র ৪০০ কিলোমিটারের উচ্চতায় উঠতে পেরেছে এবং এদের গতিবেগ দাঁড়িয়েছে সেকেণ্ডে ২.৫ কিলোমিটারের কাছাকাছি। উচ্চতা এবং বিশেষ করে গতিবেগ আরো বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা আছে দেখেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে আমরা মহাজাগতিক ভ্রমণের

পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার কাছাকাছি এসে পড়েছি। সেদিন আর খুব দূরে নেই যেদিন সর্বপ্রথম স্বয়ংচালিত বিমান বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটারের মত মহাজাগতিক গতিবেগ অর্জন করে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবে।

এই উপগ্রহটি, এঞ্জিন বন্ধ অবস্থাতে জ্বালানির খরচ ছাড়াই, ভূ-পৃষ্ঠের সামন্তরাল কক্ষপথে যতদিন খুশি ভ্রমণ করবে। এই রকম সঞ্চরণের ফলে উদ্ভূত উৎকেন্দ্রিক এবং কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিই রকেটটিকে পৃথিবী থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে আটকে রাখবে। এই স্বয়ংচালিত মহাজাগতিক বিমান চাঁদের মতই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে, পৃথিবীর কাছেও এসে পড়বে না, পৃথিবী থেকে দূরেও চলে যাবেনা।

উপগ্রহটিতে যে সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বসানো থাকবে তার সাহায্যে আমরা যে সব রিপোর্ট পাব তা আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সুদূর অভিযানের পথ করে দেবে। এসব সম্বন্ধে এখন আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পরে মহাজাগতিক যাত্রায় স্বয়ংচালিত বিমানের সঙ্গে পাঠানো হবে জীবিত প্রাণী—বানর, খরগোস এবং পৃথিবীর আরো অন্যান্য প্রাণী।

বিমানটিতে বসানো টেলিভিশন যন্ত্র অবিরাম এই সমস্ত প্রাণীর আচার ব্যবহার এবং তারা কেমন থাকে তা বর্ণনা করে যাবে এবং পৃথিবীতে রিপোর্ট পাঠাতে থাকবে। নতুন অপরিচিত পরিস্থিতিতে এই জীবিত প্রাণীদের আচার ব্যবহার

কি রকম হয় টেলিভিশনের পর্দায় তা বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এই পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে যখন এবং এই অবস্থায় জীবিত প্রাণীর টিকে থাকা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যখন নিশ্চিত হবেন তখনই শুধু বহু প্রতীক্ষিত ভ্রমণপথে গ্রহান্তর গামী বিমানে করে অনুসন্ধানী অভিযাত্রীদল পাঠানো হবে। ওরা স্বয়ংচালিত বিমানের মতই পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমা করবে।

তারপর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত মালবাহী বিমানের সাহায্যে বহির্জাগতিক স্টেশনটিকে শূন্যে পাঠানো হবে। পাঠাবার আগে এটি পৃথিবীতে ভালভাবে পরীক্ষিত এবং নির্মিত হওয়া দরকার। এটিকে পাঠানো হবে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে। সেখানে, বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরে গ্রহান্তর-গমনবিদ্যাভিজ্ঞ নির্মাতারা অংশগুলিকে একটা কাঠামোতে জুড়ে ফেলবে। সুদূরগামী মহাজাগতিক বিমানের জন্য যে সব মালপত্রের দরকার তা সবই এই পৃথিবীসমীপবর্তী মহাশূন্যে অবস্থিত স্টেশনটিতে জমায়েত থাকবে। এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের অবস্থানের জন্যও ব্যবস্থা করা থাকবে।

এমন একটা শক্তির উৎস যদি আমাদের আয়ত্তে আসে যার দ্বারা মহাজাগতিক বিমানকে সেকেণ্ডে দশ কিলো-মিটারের মত গতি বেগ দিয়ে দেওয়া যায়, তবেই পৃথিবী থেকে সোজাসুজি চাঁদে এবং সম্ভবত মঙ্গলে এবং শুক্রেও যাত্রা করা যেতে পারে। যদি পৃথিবীসমীপবর্তী মহাশূন্যে অথবা অন্যকোন আকাশচারী বস্তুপিণ্ডে অবস্থিত বহির্জাগতিক স্টেশনকে

ব্যবহার করা যায় তাহলে সৌরমণ্ডলের আরো দূরবর্তী গ্রহেও যাওয়া সম্ভব হবে। আন্তগ্র্হ যোগাযোগ ব্যবস্থাটা হল প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনবার ব্যাপক সংগ্রামেরই অংশ। এই বিরাট কাজ একজন মাত্র উৎসাহীর একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এই কাজে বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত বিভাগের লোকেরই অংশ গ্রহণ দরকার—পদার্থবিজ্ঞানী, রাসায়নিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতশাস্ত্রবিদ্, জীববিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ, জীববিজ্ঞানী ভূতত্ত্ববিদ এবং আরো অন্যান্য পণ্ডিতদের সকলেরই এই কাজে অংশ নিতে হবে।

মহাজাগতিক মহাশূন্য সম্বন্ধে গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবার জন্য সোবিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদামীর একটি স্থায়ী অন্তর্বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশনের বিরাট দায়িত্ব। এর অন্যতম আশু দায়িত্ব হচ্ছে মহাশূন্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় বীক্ষণাগার যাতে তৈরি করা যায় তার সুসংগঠিত ব্যবস্থা করা।

এই রকম একটি বীক্ষণাগারের সৃষ্টি হলে তা হবে গ্রহান্তর্বর্তী যোগাযোগস্থাপনের সমস্যা সমাধানের পথে প্রথম ধাপ।

পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যকে আয়ত্তে আনার সম্পর্কে এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলছে তা ক্রমশই ব্যাপক বৈজ্ঞানিক মহলের বেশি বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের ভ, প, চ্কালফ্ কেন্দ্রীয় এরো-ক্লাবে

গ্রহান্তর গমন বিদ্যা বিভাগের সৃষ্টি করে শত শত বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনিয়ার এবং ছাত্রকে একত্রিত করা গিয়েছে। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাজাগতিক ভ্রমণকে সম্ভব করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা যাতে করা যায় তার জন্য এ বিষয়ের মৌলিক সমস্যাগুলি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন।

বর্তমানে বিভাগটিতে পাঁচটি বৈজ্ঞানিক কমিটি কাজ করছে; একটি কমিটি কাজ করছে গ্রহান্তর গমন বিদ্যার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক এবং পদার্থ বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলি নিয়ে, একটি কমিটি কাজ করছে মহাজাগতিক মহাশূন্যে বিমান চালনার বিষয় নিয়ে, একটি রকেট যন্ত্রবিদ্যা নিয়ে, আরেকটি মহা-জাগতিক ভ্রমণের জীববৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে এবং আরো একটি কমিটি কাজ করছে উড্ডয়নরত মহাজাগতিক বিমানের রেডিও-টেলি-কন্‌ট্রোলের বিষয় নিয়ে।

এই বিভাগটিতে এবং বৈজ্ঞানিক কমিটিগুলিতে, বিভাগের সভ্যদের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা, রিপোর্ট এবং প্রস্তাবসমূহ উত্থাপিত হয় এবং আলোচিত হয়।

যে সমস্ত মূল প্রশ্ন নিয়ে বিভাগের সভ্যরা গবেষণা ও আলোচনা করছেন এখানে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

গ্রহান্তর গমনবিদ্যার পদার্থ-বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতি-র্বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে গবেষণা বৈজ্ঞানিক কমিটির দায়িত্ব। সেই কমিটি ব্যস্ত আছে মহাজাগতিক ভ্রমণের সঙ্গে জড়িত জ্যোতিঃ-পদার্থ-বিদ্যা বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্‌স্ এবং অ্যাস্ট্রো-বোটানীর প্রশ্ন নিয়ে। উল্কা প্রবাহ ও মহাজাগতিক বিমানের

গতিবিধির উপর উল্কাপিণ্ডগুলির প্রভাব এবং পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের উপরের স্তরে সৌরবিকীরণ ও প্রাকৃতিক অবস্থা তাঁরা পর্যালোচনা করছেন। মহাজাগতিক মহাশূন্যে পৃথিবী সূর্য এবং অন্যান্য আকাশচারী বস্তুপিণ্ডের দ্বারা সৃষ্ট আকর্ষণ-ক্ষেত্রগুলিকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা এবং গ্রহগুলিতে প্রাণীর অস্তিত্বের অনুসন্ধান নিয়েও তাঁরা ব্যাপৃত রয়েছেন।

মহাজাগতিক মহাশূন্যে বিমান চালনা সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক কমিটির দায়িত্ব সেই কমিটি গ্রহান্ত যাত্রার পথ, মহাজাগতিক বিমানের অভ্যন্তরে অবস্থিত পর্যবেক্ষকের সঙ্গে সংযোগ স্থির করার উপায় এবং যন্ত্র কৌশল সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করছেন। উল্কাপিণ্ড ও গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থানের হিসাব করে সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক একটি ভ্রমণপথ নির্ধারণ করে বিমান চালনার একটি ম্যাপও তাঁরা প্রস্তুত করছেন। জেট এঞ্জিনের শক্তিকে ব্যয় না করেই মহাজাগতিক বিমান কি-ভাবে অবতরণ করতে পারে সে বিষয়ে (ঘূর্ণাকার কক্ষপথ ধরে) এবং পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্য বস্তুপিণ্ডের সঞ্চরণ ও পরিবর্তনশীল ভরের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো অন্যান্য বিষয়েও তাঁরা গবেষণা করছেন।

রকেট যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কমিটি মহাজাগতিক বিমানে ব্যবহার করা শক্তির বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান করছেন এবং মহাজাগতিক বিমান ও তার এঞ্জিন বসানোর পরিকল্পনার অনুশীলন করছেন।

এই কমিটি আরো অনুসন্ধান করছেন উল্কাপিণ্ডের আঘাত থেকে বিমানকে রক্ষা করা যায় কি করে এবং আকাশচারী বস্তুপিণ্ডের উপরে মহাজাগতিক বিমানের অবতরণ এবং সেখান থেকে যাত্রারম্ভের জন্য কি ব্যবস্থা হতে পারে। প্রচণ্ড রকমের নিম্ন এবং উচ্চ তাপমাত্রায় এবং কোন প্রকার চাপ না থাকলে বস্তুর অবস্থা কি হয় তাও এই কমিটি পর্যালোচনা করছেন।

মহাজাগতিক ভ্রমণের জীববিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদি সম্বন্ধে দায়িত্ব যে-বৈজ্ঞানিক কমিটির সেই কমিটি অনুশীলন করছেন কি-ভাবে স্বল্পপরিসর নিশ্ছিদ্ররূপে আটকানো কামরার মধ্যে মানুষের থাকার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। দীর্ঘকালব্যাপী বাড়তি ভারের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব, মানব দেহের উপর আকর্ষণশক্তির স্বল্পতার বা আকর্ষণশক্তির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির প্রভাবও তাঁরা অনুশীলন করছেন। এছাড়াও উড্ডয়নের সময় জীবদেহের বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াগুলি রেকর্ড করার পন্থা নিয়ে তাঁরা চর্চা করছেন, আর অনুশীলন করছেন জীবদেহের উপর সৌর এবং অন্যান্য বিকীরণের প্রভাব ইত্যাদি।

মহাজাগতিক বিমানের রেডিও-টেলি-কণ্ট্রোল সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক কমিটির দায়িত্ব সেই কমিটি ব্যাপৃত রয়েছেন মহাজাগতিক বিমানের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার চর্চা নিয়ে; তাঁরা খুঁজে বার করেছেন মহাজাগতিক বিমানের নিয়ন্ত্রণের উপায়, তাঁরা চর্চা করছেন নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রাদির সঙ্গে সংযুক্ত টেলিভিশন কি রকম হবে এবং আকাশচারী বস্তুপিণ্ডগুলির

উপরিভাগ অনুসন্ধানের উপায় কি হতে পারে সেইসব নিয়ে ; তাছাড়া আরো অন্যান্য প্রশ্ন নিয়েও তাঁরা গবেষণা করেছেন।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক কমিটিগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকায় গ্রহান্তর্বর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার সঙ্গে জড়িত সমস্ত প্রশ্নগুলিরই বিশদ গবেষণা সম্ভব হচ্ছে।

পৃথিবী সমীপবর্তী মহাশূন্যকে আয়ত্তে আনা সম্পর্কে যেসব বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলি উঠেছে সেই সমস্ত প্রশ্নের ফলিত এবং তাত্ত্বিক আলোচনার উন্নতির জন্য সোবিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদামীর সভাপতিমণ্ডলী ৎসিওলকভ্স্কির নামে একটি স্বর্ণপদকের প্রবর্তন করেছেন। আন্তর্গ্রহ যোগাযোগ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপরে তিন বছরে একবার এই পদক পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই রকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ অত্যন্ত জটিল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মকে এইভাবে উৎসাহ দিলে তার ফলে বৈজ্ঞানিক সমস্যাটির সমাধান নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত হবে।

প্রথম মহাজাগতিক বিমানের যাত্রার দিন এখনও আসেনি বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ গ্রহান্তর গমনবিদ্যা বিশারদ এবং বৈমানিকরা সমস্ত সমস্যারই সমাধান করে চলেছেন। ভবিষ্যৎ মহা-জাগতিক যাত্রার ছোটখাট খুঁটিনাটিগুলিকে তাঁরা উদ্ভাবন করছেন, গহান্তরগামী বিমান কি রকম হবে ও তার মধ্যে

কি ভাবে মানুষ যাত্রা করতে পারবে এ সমস্ত বিষয়ে একটার পর একটা নতুন উদ্ভাবন তাঁরা করছেন এবং এই সমস্তের ফলে গ্রহান্তর্বর্তী পথের পরিকল্পনা এগিয়ে যাচ্ছে।

বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতন স্তরে, তার বাইরে এবং শেষ পর্যন্ত মহাজাগতিক মহাশূন্যে পরিভ্রমণের ব্যাপারে যে সব সমস্যা এসে দেখা দিচ্ছে তা অসংখ্য নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সৃষ্টি করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সমস্যার এখনো পর্যন্ত খুব সামান্যই সমাধান হয়েছে। সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন।

আধুনিক উড়োজাহাজের উদ্ভব যেমন সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়ার, বৈমানিক প্রভৃতি বহু লোকের কাজের ফলে এবং এঁদের সকলকার কাজের ফলেই যেমনভাবে বৈমানিক গতিবিধির রীতি, এঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বিমান চলাচল পথ নির্বাচন প্রভৃতি সব বিষয়ে ক্রমশ সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি করেই মহাজাগতিক মহাশূন্য জয় করবার জন্যও দরকার হল বিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের এক বিরাট সমবেত কর্মোদ্যোগ।

যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি এবং আরো অন্যান্য দেশের বর্তমান গ্রহান্তর-গমন-বিদ্যা সমিতিগুলি মিলিত হয়ে এরি মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক-গ্রহান্তর-গমনবিদ্যা ফেডারেশন গঠন করেছেন।

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে কোপেনহেগেন শহরে গ্রহান্তরগমনবিদ্যা কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আন্তগ্র্হ যোগাযোগ ব্যবস্থার সংগঠন এবং পরিচালনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক-বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সংযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সোবিয়েত বিজ্ঞান আকাদামির নেতৃত্বে যে স্থায়ী আন্তর্বিভাগীয় কমিশন রয়েছে, তার সভাপতি সোবিয়েত বিজ্ঞানী আচার্য ল, ই, সেদফ্ এবং অধ্যাপক ক, ফ, ওপোরোদ্নিকফ্ সেই অধিবেশনে পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসে গ্রহান্তর গমনবিদ্যার বিভিন্ন সমস্যার উপর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা পড়া হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসরটি চলবে সেই সময়ে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়বার জন্য আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের প্রস্তাবটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এই সময়ে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতন স্তর, মহাজাগতিক মহাশূন্য, সূর্য এবং অন্যান্য আকাশচারী বস্তুপিণ্ডের প্রাকৃতিক এবং অন্যসব অবস্থাগুলি অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের জন্য সোবিয়েত ইউনিয়ন সহ সমস্ত বিশ্বে একটি সুসংবদ্ধ কার্যসূচী অনুসরণ করা হবে।

এই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এই সব সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পারবে।

ঐ কংগ্রেসে ঐ রকম উপগ্রহেরই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই গোলকগুলির অধিকাংশটাই হবে শূন্য। এ গুলির ব্যাস হবে ২০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার। এতে থাকবে বিভিন্ন রকমের পরিমাপক যন্ত্রপাতি।

অনুমান করা হচ্ছে যে এইসব গোলকগুলিকে তিন স্তর বিশিষ্ট রকেটের সাহায্যে ১৫০ থেকে ৩৫০ কিলোমিটারের উচ্চতায় ছুঁড়ে দেওয়া হবে। সেখানে এগুলির গতিবেগ দাঁড়াবে ঘণ্টায় ৩০,০০০ কিলোমিটার।

সোবিয়েত বিজ্ঞানী আচার্য সেদফ্-এর প্রস্তাবও কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে বিভিন্ন মাপের এবং ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্ণ যান্ত্রিক সম্ভাবনা বর্তমান আছে।

জার্মান বিজ্ঞানী কেলি তাঁর রচিত গ্রহান্তর্বর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা কর্মসূচী কংগ্রেসে পেশ করেছিলেন। এই কর্মসূচীতে ধরা হয়েছে যে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মনুষ্য অধ্যুষিত মহাজাগতিক বীক্ষণাগারের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করা হবে এবং পৃথিবীসমীপবর্তী মহাশূন্যে মানুষ এবং মালপত্র পাঠানোর জন্য পর পর রকেট বিমান তৈরি করা হতে থাকবে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত চাঁদে অভিযানের প্রস্তুতি চালাতে হবে, আর তারপর ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রস্তুতি চলবে মঙ্গলগ্রহে অভিযানের।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে চিন্তা করলে এটা পরিষ্কার মনে হয় যে মহাজাগতিক মহাশূন্যকে আয়ত্ত করার পথে এই যে সব বিরাট সমস্যাগুলি রয়েছে তার সমাধান নিশ্চয়ই সম্ভব,—অবশ্য তার জন্য শান্তিপূর্ণ এবং শুভ উদ্দেশ্যে মহাজাগতিক ভ্রমণের ক্রমোন্নতির জন্য

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী মহলের প্রচেষ্টা সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের আস্থা আছে যে আমাদের এবং আমাদের সমসাময়িকদের চোখের সামনেই এইসব কিছু ঘটবে। শত শত শতাব্দীর ধূলি ধূসরিত চাঁদের মাটিতে প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কনকারী মানুষের দলটির সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক যাবেন তাঁর লেখা রোজনামচাটি নিশ্চয়ই খুব চিত্তাকর্ষক হবে। যে সব লোক কোনদিন পৃথিবী ছেড়ে যায়নি তাদের কল্পনা যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে এই বৈজ্ঞানিকের রোজনামচা তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক হবে।

আমরা এটা বিশ্বাস করি, কারণ, "মানুষ সেই সমস্ত সমস্যার কথাই বলে থাকে যা সমাধান করতে তারা সক্ষম। আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে মনে হয় যে, কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই যখন সেই সমস্যার সমাধানের বাস্তব অবস্থার আবির্ভাব হয়ে গিয়েছে, অথবা আবির্ভাবের পথ খুলে গেছে।" (কার্ল মার্ক্স্)।

আন্তগ্র্হ যাত্রার এই বিরাট সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পন্থাই বর্তমান বিজ্ঞানের অস্ত্রশালার মধ্যে বর্তমান,—শক্তিশালী রকেট যন্ত্রবিদ্যা, আণবিক শক্তি, রেডিও-টেলি-কন্ট্রোল ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি এবং আরো অন্যান্য বহু কিছু। ভূমণ্ডলের সমস্ত রাষ্ট্রের সরকার এবং জনগণের গুরু দায়িত্ব হল মানুষের প্রতিভার এই মহত্তম বিকাশকে বিধ্বংসী যুদ্ধের কাজে না লাগিয়ে, তাকে সমগ্র

মানবতার মঙ্গলে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যার আরো অগ্রগতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা।

সোবিয়েত ইউনিয়নের ভ, প, চ্কালফ্ কেন্দ্রীয়
এরোক্লাবের গ্রহান্তর গমনবিদ্যা
শাখার সভাপতি
ন, আ, ভার্বারফ্